একাত্ম মানববাদ

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়

ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ
৬, মুরলীধর সেন লেন,
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক ঃ
ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে
প্রতাপ ব্যানার্জী,
সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ

প্রকাশকাল ঃ ২০১৮, মহালয়া

মূল্য ঃ ৪০ টাকা মাত্র

মুদ্রক ঃ
আশুতোষ লিথোগ্রাফি
৬, ছিদাম মুদি লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৬

ভূমিকা

একাত্ম মানববাদ ভারতীয় জনতা পার্টির রাজনৈতিক দর্শন। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এই দর্শনের স্রষ্টা ছিলেন। যিনি ভারতীয় জনসংঘের সভাপতি ছিলেন, বর্তমানের ভারতীয় জনতা পার্টি পূর্বে ভারতীয় জনসংঘ নামে পরিচিত ছিল, যার স্থাপক ছিলেন ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

১৯৬৫ সালে গোয়ালিয়রে ভারতীয় জনসংঘের প্রতিনিধি সভার অধিবেশনে দীনদয়ালজী একাত্ম মানববাদ আলোচনার জন্য উত্থাপন করেছিলেন এবং বিস্তারিত আলোচনার পর ঐ বছরেই বিজয়ওয়াড়া দলের সর্বভারতীয় সম্মেলনে তা গৃহীত হয়।

দীনদয়ালজী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোতে দলীয় কর্মীদের 'একাত্ম মানববাদ' দর্শন আলোচনা করে সকলকে ভবিষ্যৎ ভারতীয় রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে অবহিত করেন। গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষে তিনি কলকাতায় তিনদিনের এক শিবিরে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসামের দলীয় নেতাদের কাছে 'একাত্ম মানববাদ'-এর বিষয়টা তুলে ধরেন। তিনি ঐসব বক্তৃতা হিন্দীতে করেছিলেন। পরবর্তীকালে Integral Humanism নাম দিয়ে ইংরাজীতে বই আকারে দলের পক্ষ থেকে তা প্রকাশ করা হয়। দলের বিশিষ্ট নেতা প্রয়াত হরিপ্রসন্ন মিশ্র এটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এবং ১৯৭৫ সালে এটি বাংলা ভাষায় প্রথম বই আকারে প্রকাশিত হয়।

বি.জে.পি.-র রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি হল—একাত্ম মানববাদ। আজকের সমস্যা জর্জরিত অশান্ত এই পৃথিবীতে মানুষ যখন 'সভ্যতার সংকট'-এর মুখোমুখি, আদর্শ, নৈতিকতা তথা মূল্যবোধগুলো যখন হারিয়ে যেতে বসেছে, তখন 'একাত্ম মানববাদ'-ই হতে পারে একমাত্র আলোকবর্তিকা—মানুষের মুক্তির পথ।

সারা বিশ্ব ধনতন্ত্র, রাজতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে এদেশের কমিউনিস্ট দলগুলোর হাঁসজারু অবস্থা, সমাজবাদীদের 'বৈপ্লবিক স্বপ্ন' দেখার দিন শেষ, কংগ্রেসের দেউলিয়াপনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জনতা পার্টির নীতিনিষ্ঠ রাজনীতিই একমাত্র পথ—যা একাত্ম মানববাদের শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে সঠিক দিশায় জনমানসকে পরিচালিত করে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষকে সামনে রেখে ধর্মরাজ্য (Law of individual society) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশকে শক্তিশালী করতে বদ্ধপরিকর।

ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি মানুষের আগ্রহ যত বাড়ছে, এই বইয়ের চাহিদাও তত বাড়ছে। সেই চাহিদা মেটাতেই এটি পূণর্মুদ্রণ করা হল। অনিচ্ছাকৃত ভুলভ্রান্তি হয়তো থেকে গেল। পরবর্তীতে সেগুলো সংশোধন করা হবে।

ভারতমাতা কী জয়। বন্দে মাতরম্।

৬, মুরলীধর সেন লেন,
কলকাতা-৭০০ ০৭৩
মহালয়া, ২০১৮

বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী
সহ-সভাপতি
ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ

ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

একাত্ম মানববাদ ভারতীয় জনতা পার্টির মূল দর্শন। পঞ্চম সংস্করণে এমন কিছু মারাত্মক প্রমাদ ছিল, যার ফলে বাক্যের অর্থ পালটে যাচ্ছিল। এই সংস্করণে সেগুলি শুদ্ধ করে দেওয়া হলো। আজকের রাজনীতিতে একাত্ম মানববাদ প্রত্যেকটি মানুষের কাছে কত প্রয়োজনীয়, সেটুকু সবাই উপলব্ধি করলে; ঁপণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানানো সম্ভব হবে।

মহালয়া, ২০১৮

প্রতাপ ব্যানার্জী
রাজ্য সাধারণ সম্পাদক
ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ

যতদিন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিল ততদিন সমস্ত আন্দোলন ও রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল ‘‘বৈদেশিক শাসনের অবসান এবং স্বাধীনতা অর্জন’’ কিন্তু নূতন ভারতবর্ষের রূপ কি হইবে এবং কোন পথে আমরা অগ্রসর হইব এই সকল প্রশ্ন তখন পূর্ণরূপে বিবেচিত হয় নাই। কিন্তু সেই সময়েও এমন লোক ছিলেন যাঁহারা এই প্রশ্ন বিবেচনা করিয়াছিলেন। গান্ধীজী তাঁহার ‘‘হিন্দী স্বরাজ’’ পুস্তকে স্বাধীন ভারত সম্পর্কে তাঁহার ধারণা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে লোকমান্য তিলক তাঁহার ‘‘গীতারহস্য’’ পুস্তকে ভারতের পুনরুত্থানের দার্শনিক পটভূমিকা আলোচনা করেন। ইহাতে সমগ্র পৃথিবীর তদানীন্তন বিভিন্ন মতবাদের তুলনামূলক আলোচনাও করা হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রস্তাবের মাধ্যমে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করেন। কিন্তু সেই সময় যতটুকু চিন্তা করা হইয়াছিল তদপেক্ষা অনেক বেশী চিন্তা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন রহিয়াছে। তখন এই সকল বিষয়ে লোকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষিত হয় নাই কারণ প্রত্যেকেই বিশ্বাস করিতেন যে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের উপায় নির্দ্ধারণ মুখ্য উদ্দেশ্যে অন্যান্য বিষয় পরে নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে। শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ বিষয়ের আলোচনায় কালক্ষেপ করা সেদিন উপযুক্ত বিবেচিত হইত না। সুতরাং আদর্শের পার্থক্য যদি থাকিয়াও থাকে তবে তাহা সাময়িক ভাবে এড়াইয়া যাওয়া হইত।

ফলস্বরূপ যাহারা মনে করিতেন যে সমাজতন্ত্রই ভবিষ্যৎ ভারতে ভিত্তি হইয়া প্রয়োজন তাঁহারাও কংগ্রেসের মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীরূপে কাজ করিয়াছিলেন কোন স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের চেষ্টা করেন নাই। বিপ্লবীরাও তাঁহাদের নিজস্ব পন্থায় স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করিতে ছিলেন। সকলেরই এক বিষয়ে একমত ছিলেন যে প্রথম কার্য্য ভারতের স্বাধীনতা অর্জন।

স্বাধীনতা লাভের পর স্বভাবতই এ প্রশ্ন আমাদের মনে জাগা উচিত ছিল যে এখন যখন আমরা স্বাধীন হইয়াছি তখন আমাদের প্রগতির বা বিকাশের লক্ষ্য কি হইবে? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ইহাই যে এই বিষয়ে সুচিন্তিত কোন লক্ষ্য নির্দ্ধারিত হয় নাই এবং দেশ স্বাধীন হইবার সতের বৎসর পরেও আমরা বলিতে পারি না আমাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি?

ভারত কোন পথে?

বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেসী ও অন্যান্যরা ‘‘কল্যাণকর রাষ্ট্র’’, ‘‘সমাজতন্ত্র’’ ‘‘উদারনৈতিকতা’’ ইত্যাদি তাঁহাদের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ধুয়া তোলা ইহয়াছে ঠিকই কিন্তু যে আদর্শের কথা বলা হইয়াছে তাহা উপেক্ষিতই রহিয়া গিয়াছে। ইহা আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা। জনৈক বিশিষ্ট নাগরিক একদিন আমাকে বলিতেছিলেন যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভালোভাবে লড়াই করা যায়, আজকাল রাজনৈতিক দলগুলিও

এই কৌশলই অবলম্বন করিতেছে। সুতরাং তাহার পক্ষে এই প্রকার প্রস্তাব উত্থান কোন বিস্ময়ের বিষয় নহে। যাহা হউক, আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম যে আমরা কর্মসূচী গ্রহণ করিব? যদি এই প্রকার সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠিত হয় তবে তাহার কর্মসূচী বা কার্য্যক্রমের ধারণা অবশ্য থাকা প্রয়োজন। আমাদের অর্থনীতি কি হইবে? আমাদের বৈদেশিক নীতিই বা কি হইবে?

"এজন্য চিন্তা করিবেন না। আপনি যে নীতি ইচ্ছা তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন। আমরা চরম সাম্যবাদ হইতে পুঁজিবাদ পর্য্যন্ত যে কোন কর্মসূচি সমর্থনে প্রস্তুত।" তিনি এমন অবলীলাক্রমে এই উত্তর দিলেন যেন ইহাই স্বাভাবিক। তাঁহার কোন নীতি গ্রহণের অসুবিধা নাই। একমাত্র উদ্দেশ্য হইলেন যেন তেন প্রকারেণ কংগ্রেসকে পরাজিত করা। এখনও অনেকে আছেন যাঁহারা মনে করেন যে কম্যুনিস্ট ও অন্যান্যদের সহযোগিতাতেও কংগ্রেসকে পরাজিত করা প্রয়োজন।

এই সকল নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট, মুসলিম লীগ, স্বতন্ত্র পার্টি, এস.এসপি., বিদ্রোহী কংগ্রেস, আর. এস. পি প্রভৃতি যুগ্ম অথবা বহুমুখী মৈত্রীতে আবদ্ধ হইয়াছেন। ফলস্বরূপ একথা চিন্তা করা দুরূহ যে এই সকল দলের কোন একটির কোন নির্দ্দিষ্ট আদর্শ আছে।

কংগ্রেসেরও ঠিক একই অবস্থা। যদিও কংগ্রেস লক্ষ্য হিসাবে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের কথা বলে তথাপি বিভিন্ন নেতার আচরণে একটি জিনিষেই প্রমাণিত হয় যে কংগ্রেসের কোন নির্দ্দিষ্ট নীতি বা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য নাই। কংগ্রেসের মধ্যে গোঁড়া কম্যুনিস্টরা আছেন। আবার সেখানে এমন লোকও আছেন যাহারা পুঁজিবাদে বিশ্বাসী ও উগ্র কম্যুনিষ্ট বিরোধী। কংগ্রেসে আজ সকল মতের লোকের ভীড় দেখা যাইতেছে। যদি এমন কোন যাদু বাক্স থাকে যাহাতে সাপ ও বেজী একত্র বাস করে তবে তার নাম কংগ্রেস।

আমাদের চিন্তা করিতে হইবে যে আমরা এই অবস্থায় প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব কিনা? যদি আমরা আমাদের দেশের বর্তমান সমস্যাগুলির কারণ নির্দ্ধারণ করিতে চাই তবে দেখিব যে আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্তরা এই বিশৃঙ্খলার মূল কারণ। আমার একথা বুঝি যে ভারতবর্ষের একশত পঁচিশ কোটি লোকের কোন একটি বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভবপর নয়। ইহা কোন দেশেই হয় না। তথাপি প্রত্যেক জাতির একটি সাধারণ আশা আকাঙ্খা থাকে। যদি এই সাধারণ আকাঙ্খাকে ভিত্তি করিয়া লক্ষ্য নির্ধারনের চেষ্টা হয় তবেই সাধারণ মানুষ অনুভব করে যে জাতি ঠিক পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহা দ্বারাই একতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। এই কথার সত্যতা গত ১৯৬২ সালের চীনা আক্রমণের সময় প্রমাণিত হইয়াছে। সমগ্র দেশে বিরাট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল। সক্রিয়তা ও স্বার্থত্যাগে বিপুল ভাবে প্রকার হয় এবং সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেদিন বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। ইহা কি প্রকারে ঘটিল? বৈদেশিক ভ্রুকুটি আমাদের নিজেদের আত্ম উপলব্ধির সহায়ক

হয় এবং সমগ্র জনমানসের আকাঙ্খার অনুকূল নীতি সরকারকে গ্রহণ করতে বাধ্য করে। সমগ্র দেশে আত্মমর্য্যাদাবোধ জাগ্রত হইয়া উঠে।

আমাদের সম্যস্যার মূল-আত্ম উদাসীনতা

আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এই বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা না করিলে স্বাধীনতা অর্থহীন হইয়া পড়ে। ইহার অভাবে স্বাধীনতা কখনই সমৃদ্ধি বা সুখের আস্বাদ দিতে পারে না। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত না হইব, ততদিন আমরা আমাদের উন্নতি সাধন করিতে পারিব না। বৈদেশিক শাসনে এ স্বকীয় সত্বাকে দাবাইয়া রাখা হয়। এই কারণে লোকে স্বাধীনতা অর্জন করিতে চাহে, যাহাতে তাহারা তাহাদের স্বাভাবিক প্রবণতা ও চেষ্টায় সুখ ও সমৃদ্ধির অধিকারী হয়।

প্রকৃতি আজও শক্তিশালী। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাইবার চেষ্টা করিলে বা তাহাকে অবহেলা করিলে বিপর্য্যয় ঘটে। স্বাভাবিক প্রকৃতিকে অস্বীকার করা যায় না কিন্তু ইহার উৎকর্ষ সাধন দ্বারা সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। মনস্তত্বে আমরা দেখি যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দাবাইয়া রাখার চেষ্টার ফলে মস্তিস্কের বিকার ঘটে। এই প্রকার ব্যক্তি অস্থির ও হতাশ হইয়া পড়ে। জাতিরও ব্যক্তির মত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দাবাইয়া রাখার চেষ্টা হইলে বিকৃতি ঘটিয়া তাহাতে বহু ব্যাধি দেখা দেয়। ভারতে যে বর্তমান সমস্যা তাহার মূল কারণ তাহার স্বকীয় (বৈশিষ্ট) বা স্বাভাবিক প্রকৃতির প্রতি ঔদাসীন্য।

সুবিধাবাদ জনমনে অবিশ্বাস জাগাইতেছে

যাঁহারা আজ জাতিকে পরিচালিত করিতেছেন বা যাহারা আজ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশ এই মূল কারণ সম্বন্ধে অবহিত নন। ফলে আদর্শহীন সুবিধাবাদীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। দল ও নেতাদের না আছে কোন উদ্দেশ্য বা আদর্শ, না আছে কোন চরিত্রবত্তা। একজন লোক এক দল ছাড়িয়ে অপর দলে যোগদান করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না। এমন কি দলিয় মৈত্রী বা দলভুক্তি কোন আদর্শের বিচারে হয় না হয় ক্ষমতালোভে ও নির্ব্বাচনে সাফল্যের আশায়। ১৯৩৯ সালে শ্রী হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হন। পরে যখন তিনি কংগ্রেসে যোগদান করিলেন তখন তিনি নীতিগতভাবে পদত্যাগ করিয়া কংগ্রেস টিকিটে নির্বাচন প্রার্থী হইলেন। ১৯৮৪ সালে যখন সামজতন্ত্রীরা কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন তখন তাঁহারও সকলে পদত্যাগ করিয়া পুনরায় নির্বাচন প্রার্থী হইলেন। কিন্তু ইহার পর এই সৎ আদর্শ বিসর্জিত হইয়াছে। এখন রাজনীতিকে যেন অবাধ "লাইসেন্স" দেওয়া হইয়াছে। ফলে জনমনে সকলের প্রতিই অবিশ্বাস জাগিতেছে। খুব কম লোকই আছেন যাহাদের সততা

ও আদর্শ নিষ্ঠায় আজ লোকে বিশ্বাস করে। এই অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই প্রয়োজন, অন্যথায় সমাজে ঐক্য ও নিয়মানুবর্তিতা কখনই প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

আমাদের লক্ষ্য কি হইবে?

বর্তমানে সমগ্রজাতি সম্পূর্ণ দ্বিধাগ্রস্ত। কিছু লোকের মতে আমরা হাজার বৎসর পূর্বে যেখানে ছিলাম (অর্থাৎ যখন বৈদেশিক আক্রমণ প্রথম আমাদের জীবনযাত্রা বির্পয্যস্ত করে) সেইখান হইতে পুনরায় আরম্ভ করা উচিত। কিন্তু জাতি একটি বস্তুখন্ডের মত নির্জীব পদার্থ নহে যে তাহা যতদিন খুশী ফেলিয়া রাখিয়া পরে ব্যবহার করা যাইবে। এতদ্ব্যতীত একথা বলাও ঠিক হইবে না যে হাজার বৎসরের বৈদেশিক শাসন আমাদের জাতীয় জীবনস্রোতে এমন বাধার সৃষ্টি করে যে আমরা এই হাজার বৎসর সম্পূর্ণ অনড় বা নিস্কর হইয়াছিলাম। জাতি অবশ্যই এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাহার প্রতিভা দ্বারা এই 'চ্যালেঞ্জের' মোকাবিলা করিয়াছে। আমরা আমাদের জীবনের বিকাশ এবং বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্ত হইবার জন্য নিরলস সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছি। আমাদের জাতীয় জীবন স্রোত কখনও রুদ্ধ হয় নাই। গঙ্গার জলস্রোতকে পিছনে লইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। কাশীর গঙ্গার জল হরিদ্বারের মত স্বচ্ছ না হইতে পারে তথাপি ইহা সেই পবিত্র গঙ্গা। ইহার মধ্যে বহু উপনদী ও খালবিল আসিয়া মিশিয়াছে কিন্তু তাহাদের আর কোন স্বতন্ত্র সত্বা নেই। গঙ্গার জলস্রোত অবিরাম বহিয়া চলিয়াছে। জাতির ক্ষেত্রেও এই সত্য প্রয়োজ্য।

এতদ্ব্যতীত পৃথিবীতে আরও বহু জাতি আছে। তাহারা বিগত সহস্রবর্ষে প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। আমাদের তখন সকল শক্তি ও লক্ষ্য স্বাধীনতা অর্জন নব নব বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধে নিয়োজিত ছিল। এই সময়ে বিশ্বের প্রগতিতে স্বভাবতঃই আমাদের অবদান কম। এখন আমরা যখন স্বাধীন হইয়াছি তখন যতশীঘ্র সম্ভব বিশ্বের প্রগতিশীল জাতিগুলির সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া অগ্রসর হইবার জন্য কি সচেষ্ট হইতে হইবে না।

এ পর্য্যন্ত কোন মতভেদের অবকাশ নাই। আসল অসুবিধা হয় যখন আমরা পাশ্চাত্য জাতিগুলির অগ্রগতি ও ইহার ফলাফল সম্পর্কে বিচারে অক্ষম হই। ইহাতে আরও জটিলতা সৃষ্টির কারণ পাশ্চাত্যের প্রতিনিধিস্বরূপে ব্রিটিশরা এই দেশ দুই শত বৎসর শাসন করিয়াছে এবং এই সময়ে তাহারা যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে যাহাতে ধীরে ধীরে জনমনে ভারতীয় সকল আদর্শের প্রতি উপেক্ষা ও পাশ্চাত্যের সব কিছু প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাহাদের জীবনযাপন প্রণালী, আচরণ, খাদ্যভ্যাস প্রভৃতিও গ্রহণ করিয়াছি। বিজ্ঞান বা কারিগরী শিক্ষার সহিত পাশ্চত্যের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মতবাদও আমাদের বিচারের ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমানের শিক্ষিত সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই সত্য উপলব্ধি

করা যাইবে। আমাদের চিন্তা করিতে হইবে যে ইহার পরিণাম ভাল না মন্দ হইবে? আমরা ব্রিটিশ রাজত্বকালে বিদেশী বস্তু বর্জন করিয়াছি কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর তাহাদের অন্ধ অনুকরণটি যেন অগ্রগতির প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। ইহা সত্য যে ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা জাতীয় প্রগতি ব্যবহত করা অনুচিত, কিন্তু একথাও বুঝিতে হইবে যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্যের জীবনযাত্রা পদ্ধতি এক নহে। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান বিশ্বের সকলের সহিত আমাদেরও গ্রহণ করার আবশ্যকতা আছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের জীবনযাত্রার আদর্শ বা পদ্ধতি সম্পর্কে সেকথা কখনই প্রযোজ্য নহে। প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে। এদেশে এমন অনেক লোক আছেন যাহারা পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতবাদকে প্রগতির দিশারী বলিয়া মনে করেন এবং আমাদের দেশে সেই সকল মতবাদ আমদানী ও প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। সুতরাং আমরা যখন আমাদের দেশকে কিভাবে উন্নত করিতে পারি তাহার উপায় নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিতেছি, তখন আমাদের পশ্চিমের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শ এবং তাহার বর্ত্তমান পরিস্থিতি অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য জাতিগুলোর উত্থান

যে সকল মতবাদ পাশ্চাত্য জনমনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান তিনটি-জাতীয়তাবাদ (Nationalism), গণতন্ত্র (Democracy) এবং সমাজতন্ত্র (Socialism)। এই সঙ্গে কিছু কিছু লোক, যাহারা বিশ্ব ঐক্য ও বিশ্ব শান্তির কথা বলেন, তাহারও রহিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। রোমান সাম্রাজের পতন এবং ক্যাথিলিক চার্চের প্রভাব কমিয়া গেলে ইউরোপে বিভিন্ন জাতির অভ্যুত্থান ঘটে। ইউরোপের বিগত সহস্র বর্ষের ইতিহাস বিভিন্ন জাতির উত্থান ও সংঘর্ষের ইতিহাস। এই সকল জাতি ইউরোপ মহাদেশের বাহিরে তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে এবং অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রকে পদানত করে। জাতীয়তাবাদ জাতি ও রাষ্ট্রকে এক করিয়া একজাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত করে সঙ্গে সঙ্গে রোমার ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব কমিবার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ন্যাশনাল চার্চের প্রতিষ্ঠা অথবা রাজনীতিক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাবের অবসান ঘটে। এই অবস্থার মধ্যেই 'সেকুলার' বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ সৃষ্টি হয়।

ইউরোপে গণতন্ত্রের জন্ম

ইউরোপের রাজনৈতিক জীবনে যে বৈপ্লবিক আদর্শ বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে তাহা গণতান্ত্রিক আদর্শ। গোড়ার দিকে প্রত্যেক জাতির প্রধানরুপে একজন রাজা ছিল। কিন্তু ক্রমশ রাজাদের স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কে জনমনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হইতে থাকে।

শিল্পবিপ্লব এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রত্যেক জাতির মধ্যে এক শক্তিশালী ব্যবসায়ী সমাজের সৃষ্টি করে। স্বভাবতই এই নতুন রাজনৈতিক অধিকারের দাবীদারগণের সহিত রাজা ও ভূস্বামীগণের সংঘর্ষ ঘটে। এই সংঘর্ষ আদর্শগতভাবে গণতন্ত্রকে তাহাদের দার্শনিক ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে। গণতন্ত্র প্রথম গ্রীসের নগর রাজ্য City States গুলির মধ্যে প্রবর্তিত হয়। সাধারণ মানুষ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই ব্যবস্থায় আকৃষ্ট হয়। ফ্রান্সে এক রক্তক্ষয়ী বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইল। ইংল্যান্ডের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্দোলন ঘটিল। গণতন্ত্রের আদর্শ সাধারণ মানুষের মনে উদ্দীপনার সঞ্চার করিল। রাজন্য প্রথা হয় বিলুপ্ত অথবা তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস পাইল, এবং সাংবিধানিক সরকার গঠিত হইল। বর্তমানের পশ্চিমী দেশগুলিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহারা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়াছে সেই হিটলার, মুসোলিনী ও স্ট্যালিনের মত একনায়করাও মুখে গণতন্ত্রের বুলিও আওড়াইয়াছে।

ব্যক্তিকে শোষণ করা হইয়াছে

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি এক ভোটের অধিকারী ছিল। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল যাহারা বিদ্রোহের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। শিল্প বিপ্লবের ফলে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থায় আশার সঞ্চার করে গৃহকার্য্য না করিয়া কর্মীরা কারখানায় মালিকের নির্দ্দেশমত কার্য্যে রত হয়। শ্রমিক তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শিল্প এলাকার জনবহুল শহরে বসবাস করিতে থাকে। কোন উপযুক্ত বাসগৃহের ব্যবস্থা ছিল না। কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার জন্য কোন আইনকানুন ছিল না তাহার অর্থাভাব ক্লিষ্ট ও অসংগঠিত ছিল। স্বাভাবতঃই তাহারা হয়রানি, অন্যায় ও শোষণের শিকারে পরিণত হইত। যাহাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল তাহারা এই মালিকদের সমগোত্রীয় লোক। সুতরাং রাষ্ট্রের দ্বারা তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের কোন আশাই ছিল না।

বহুব্যক্তি এই অন্যায়ের প্রতিবাদে আন্দোলন করিয়াছেন। তাঁহারা এই সকল নিপীড়িত শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহারা নিজেদের সমাজতন্ত্রবাদী বলিয়া ঘোষণা করেন। কার্লমার্কস তাহাদের অন্যতম। এই অন্যায়ের প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে তিনি সমগ্র মানব সমাজের ইতিহাস ও সমাজের গঠন প্রণালী অধ্যয়ন করিয়া তাহার বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করিলেন। তিনি দাবী করিলেন যে তাহার এই বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক যুক্তির ভিত্তিতে রচিত। পরবর্ত্তী সকল সমাজতন্ত্রবাদী তাহার এই আদর্শেই উদ্বুদ্ধ হইয়াছে।

সর্বহারার একনায়ত্ব

মার্কসের বিশ্লেষণ (Dialectic materialism) দ্বান্দিক বস্তুবাদ। তিনি উৎপাদনের ব্যক্তিগত মালিকানাকেই শোষণের প্রদান কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল উৎপাদনের মালিকানা যদি সমাজের হাতে থাকে (মার্কসবাদীদের নিকট সমাজ ও রাষ্ট্র অভিন্ন) তাহা হইলে আর শোষণের অবকাশ থাকিবে না। কিন্তু তাহার পূর্বে রাষ্ট্রকে এই সকল শোষণকারীর হস্ত হইতে মুক্ত করিতে হবে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে তাহাদের অভাব না থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য সর্বহারার একনায়কত্ব বা (Dictatorship of the proletoriate প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যাহাতে লোকে এই একনায়কত্ব সহ্য করে সেজন্য একটি আদর্শ ঘোষিত হইল যে যখন এই শোষক শ্রেণীকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করা হইবে এবং তাহাদের পুনরায় ক্ষমতা অধিকারের সম্ভাবনা থাকিবে না তখন এই একনায়কত্বের পরিবর্তে একটি শ্রেণীহীন, রাষ্ট্রহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে। মার্কস আরও প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলেন যে পুঁজিবাদের মধেও তাহার ধ্বংসের বীজ নিহিত রহিয়াছে।

ইউরোপের কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিয়াছে। এমনকি যেখানে বিপ্লব হয় নাই সেখানও রাজনীতি করা শ্রমিকদের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। 'কল্যাণ রাষ্ট্র' আদর্শ হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা সম অধিকার (সমাজতন্ত্রের মূলমন্ত্র সব অধিকার, সম অধিকার ও সম উপযোগিতা এক নহে) Equality is there at the root of Socialism, equality is different from equitability এই তিনটি আদর্শই ইউরোপের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই আদর্শগুলি ব্যতীতও বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব ঐক্যের আদর্শও আছে। এই সমস্ত ভালো আদর্শ। এই সকল আদর্শই মানুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক। কিন্তু এককভাবে এই সকল আদর্শই অসম্পূর্ণ। শুধু তাহাই নহে ইহাদের একটি অপরটির বিরোধী। জাতীয়তাবাদ জাতিতে জাতিতে সংঘাত সৃষ্টি করিয়া বিশ্বশান্তি বিনাশে উদ্যত হয়। পুঁজিবাদী গণতন্ত্র অবাধ শোষণের অধিকার দেয়। সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদ উচ্ছেদের গণতন্ত্র ও ব্যক্তির স্বাধিকার হরণ করে। সুতরাং পাশ্চাত্য জগত এই সকল আদর্শের সমন্বয়ের প্রয়াসে বিব্রত। তাহারা আজিও সফল হইতে পারে নাই। তাহারা একের সহিত অপরের গোঁজামিল দিবার চেষ্টা করিতেছে।

ইংলন্ড জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ফ্রান্স তাহা করিতে পারে নাই। সেখানে গণতন্ত্র রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করিয়াছে। ব্রিটিশ লেবার পার্টি গণতন্ত্র ও

সমাজতন্ত্রের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সমাজতন্ত্র জোরদার হইয়া উঠলে গণতন্ত্র অব্যহত থাকিবে না বলিয়া লোকে আশংকা প্রকাশ করিতেছে। ফলস্বরূপ লেবারপার্টি আর মার্কসবাদীদের মত জোরের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কথা বলেন না। হিটলার ও মুসলিনী জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের নীতি গ্রহণ করেন এবং গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করেন। শেষ পর্য্যন্ত সমাজতন্ত্রবাদ তাহাদের জাতীয়তাবাদী অভিসন্ধি পূরণের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে সমগ্র বিশ্বের শান্তি ও ঐক্য বিঘ্নিত হইবার আশংকা দেখা দেয়। আমরা পশ্চিম হইতে কিছু নির্দেশলাভের আশা করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাদের দিবার মত সঠিক আদর্শ নাই। তাহারা নিজেরাই পথসন্ধিতে বিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতেছে এবং কোনটি প্রকৃতপক্ষে শ্রেয় তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছে না। এই অবস্থায় আমরা তাহাদের নিকট কি প্রত্যাশা করিতে পারি?

পক্ষান্তরে আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে যে বিশ্বের এই পরিস্থিতিতে ভারতের কোন অবদান আছে কিনা। বিশ্বের প্রগতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা কোন আদর্শ তাহাদের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারি? যদি আমাদের নিকট এমন কোন সম্পদ থাকে যাহা বিশ্বের অগ্রগতির সহায়ক হয় তবে তাহা অপরকে দান করিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত হইবে না। এই ভেজালের যুগে নতুন কোন সংমিশ্রণ না করিয়া আমাদের কোন বিশেষ আদর্শ গ্রহণের পূর্বে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। পৃথিবীর পক্ষে ভারস্বরূপ না হইয়া আমাদের উচিত পৃথিবীর সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হওয়া। আমাদের আরও চিন্তা করিতে হইবে যে আমাদের ঐতিহ্য ও সভ্যতার বিশ্বসংস্কৃতিতে কি মহান অবদান আছে।

স্বাধীনতা লাভের পর গত সত্তর বৎসরের মধ্যে আমাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য কোন লক্ষ্য নির্দ্ধারিত হয় নাই। সাধারণত: লোকে এই সকল প্রশ্ন স্থিরভাবে বিবেচনা করে না। তাহারা সময়বিশেষে যে সমস্যার সম্মুখীন হয় সেই সমস্যার কথাই চিন্তা করে। কখনও অর্থনৈতিক সমস্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কখনও বা রাজনৈতিক প্রশ্ন তাহাদের নিকট গুরুত্ব লাভ করে। আমরা কোন পথে চলিলে মূল সমস্যার সমাধান ও সর্বাঙ্গীন উন্নতির পথে অগ্রসর হইব তাহা না জানায় ঠিকমত উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব ঘটে এবং যে ভাবে সাময়িক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয় তাহা প্রায়শ আংশিক বা একদেশধর্মী হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অতীত বনাম বর্তমান

যাঁহারা কোন স্থির লক্ষ্যের কথা বলেন তাঁহাদের মধ্যে দুই প্রকারের লোক আছেন। একদল বলেন যে পরাধীনতার পূর্বেকার অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া উচিত এবং সেইখান হইতে পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে আর একদল আছেন যাহার ভারতের কোন মহান অবদান আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন না এবং আমাদের অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে চাহেন না। তাহাদের নিকট পাশ্চাত্যের জীবন ও চিন্তাধারাই প্রকৃষ্ট এবং আমাদের উন্নতি করিতে হইলে সেই জীবন পদ্ধতি ও আদর্শবাদ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এই দুইটি গোষ্ঠীরই চিন্তাধারা ভ্রমাত্মক। যেহেতু এই দুইটির মধ্যে আংশিক সত্যতা আছে সুতরাং তাহাদের সম্পূর্ণ ভাবে এড়াইয়া যাওয়াই অনুচিত।

যাঁহারা বলেন যে আমাদের সেই প্রাচীনকালে হইতে পুনরায় আরম্ভ করা উচিত, তাহারা ভুলিয়া যান যে ইহা আকাঙ্খিত হউক বা না হউক বর্তমানে সেটা অসম্ভব। সময়ের স্রোত কখনই ফিরাইয়া দেওয়া যায় না।

অতীতকে অস্বীকার করা চলে না

বিগত সহস্র বৎসর যাহা আমরা গ্রহণ করিয়াছি অথবা যাহা আমাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে বর্তমানে তাহা বাদ দেওয়া অসম্ভব। তদুপরি আমাদের সমাজজীবন গঠনে আমাদের নিজস্ব অবদানও কম নাই। আমাদের সম্মুখে যে সকল সঙ্কট দেখা দিয়াছিল আমরা শুধু তাহার নিষ্ক্রিয় দর্শক ছিলাম না। অথবা আমরা শুধু বিদেশীদের কার্য্যের প্রতিরোধই করিয়াছি একথাও ঠিক নহে। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন নূতন যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি। অতএব গত হাজার বৎসরকাল যাহা ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে আমাদের চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকা সম্ভবপর নহে।

বৈদেশিক আদর্শ বিশ্বব্যাপী নহে

ঠিক সেইজন্য যাঁহারা পাশ্চাত্য আদর্শকে আমাদের প্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় মনে করেন তাহারা ভুলিয়া যান যে সকল আদর্শ বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকট হইয়াছে। এইগুলির সমস্তই সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণকর একথা বলা চলে না। এই আদর্শগুলি যে সমাজ বা রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় জন্মলাভ করিয়াছে তাহা প্রায়ই সেই সমাজের সংস্কৃতিক সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে না। এতদ্ব্যাতীত এইগুলির মধ্যে বহু আদর্শ আজ মৃত বা এযুগের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কার্ল মার্কসের আদর্শও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরিস্থিতি অনুযায়ী এমনভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে যে শুধু মার্কসীয় মতবাদ তোতাপাখীর মত আওড়াইলেই তাহা আমাদের দেশের

সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারিব না এবং অন্ধ অনুকরণ বৈজ্ঞানিক যুক্তি তথ্যের পরিবর্তে প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব সৃষ্টি করিবে। ইহা সত্যই বিস্ময়কর যে যাহারা অতীতের মৃত আদর্শগুলি দূরে ফেলিয়া দিতে চাহেন, তাহারাই আবার বিদেশের কতকগুলি প্রাচীন ও বর্তমানের অনুপযোগী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন।

আমাদের দেশ ও আমাদের সমস্যা

প্রত্যেক দেশের তাহার বিশেষ ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বর্তমান এবং দেশের নেতারা দেশের সমস্যাগুলি দেশের পটভূমিকায় পর্যালোচনাপূর্বক সমাধানে প্রয়াসী হন। একথা যুক্তিহীন যে একদেশের নেতৃবৃন্দের কোন সমস্যা সমাধানের উপায় বা পদ্ধতি সব দেশেই সমানভাবে প্রযোজ্য হইবে। একটি ছোট উদাহরণ দ্বারা ইহা পরিস্পুট হইবে। যদিও মানুষের শরীরের অঙ্গ ও গঠনভঙ্গী সমস্ত পৃথিবীতে একই প্রকার, তথাপি যে ঔষধ ইংলন্ডের লোকের পক্ষে উপযোগী, ভারতের লোকের পক্ষে তাহা অনুপযুক্ত। ব্যাধি আবহাওয়া, জল, খাদ্যাভাস ও বংশের উপর নির্ভরশীল। এমনকি বাহিরের উপসর্গ একপ্রকার মনে হইলেও একই ঔষধ সকল রোগীর ব্যাধির উপশমে সক্ষম হয় না। যাহারা একই প্রকার ব্যবস্থাপত্র সকল রোগীর প্রতি প্রয়োগ করেন তাহাদের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক না বলিয়া হাতুড়ে ডাক্তার বলিয়া অভিহিত করা হয়। এইজন্য আয়ুর্বেদে বলা হইয়াছে যে একস্থানের ব্যাধির প্রতিকার ব্যবস্থা সেইস্থানেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। সুতরাং কোন বিশেষ বৈদেশিক মতবাদ সকল ক্ষেত্রে ঠিক এইভাবে আমাদের দেশের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রযোজ্য নহে, সমীচিনও নহে। ইহা দ্বারা সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ হয় না।

মানব জ্ঞান সকলের সম্পদ

পক্ষান্তরে একথাও অনুধাবনের প্রয়োজন যে সকল চিন্তাধারা ও আদর্শ (তাহা যেখানেই উদ্ভুত হউক না কেন) সর্বদা শুধু বিশেষ ক্ষেত্র বা সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে এমন নহে। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বা বিশেষ সময়ে যাহা মানব কল্যাণের নিয়োজিত হয় তাহা কোন কোন সময় বৃহত্তর মানব সমাজের পক্ষেও কল্যাণকর হইতে পারে। সুতরাং অপরাপর সমাজের অতীত ও বর্তমান প্রগতিকে একেবারে অগ্রাহ্য করাও বিজ্ঞাচিত নয়। এই সমস্ত উন্নতির মূলে যে সত্য নিহিত তাহা অবশ্যই অনুধাবন করিতে হইবে। অন্য অবান্তর বস্তুগুলিকেও তেমনি সযত্নে পরিহার করিতে হইবে। বৈদেশিক সমাজের জ্ঞান আহরণের সহিত সেই সমাজের ভ্রান্তি ও বিকৃতি যেন আমাদের কলুষিত না করে। ইহার মধ্যে যে সকল শাশ্বত সত্য আমাদের সমাজে সৃষ্ট তাহা যেমন বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধিত রূপে গ্রহণ করিতে হইবে, তেমনই অন্যান্য সমাজে যে শাশ্বত্য সত্যের বিকাশ ঘটিয়াছে তাহাও আমাদের দেশ ও সমাজের অবস্থা অনুযায়ী সংশোধিতরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

সংঘষমূলক আদর্শ

পাশ্চাত্য রাজনৈতিক চিন্তা জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে তাহাদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সময়ে বিশ্ব ঐক্যের আদর্শ জাতিপুঞ্জ (League of Nation) বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাষ্ট্র সঙ্ঘের (U.N.O.) মধ্যে যুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিভিন্ন কারণে এগুলি সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। যাহা হউক ইহাদের মাধ্যমে এই আদর্শ সার্থক করার চেষ্টা হইয়াছে।

এই সকল আদর্শ কার্য্যত : অসম্পূর্ণ এবং পরস্পর বিরোধী

জাতীয়তাবাদ জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ এবং বিশ্বযুদ্ধের কারণ হইয়াছে। যদি বর্তমান অবস্থা বজায় রাখা বিশ্বশান্তি বলিয়া অভিহিত হয় তবে তাহার অর্থ এই হইবে সে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খা কখনই পূর্ণ হইবে না। বিশ্ব ঐক্য ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ হইতেছে। অনেকে বিশ্ব ঐক্যের জন্য জাতীয়তাবাদ বর্জন করিতে বলেন; আবার অনেকের মতে বিশ্ব ঐক্য অবাস্তব কল্পনা এবং জাতীয় স্বার্থের উপরেই তাঁহারা গুরুত্ব আরোপ করেন।

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয় সাধন প্রয়াসেও ঠিক এই প্রকার অসুবিধা দেখা দেয়। গণতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজ ইহাকে একাধিপত্য ও শোষণের অবসান হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদ শোষণের অবসানের জন্য প্রবর্তিত হইলে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মর্যাদা হরণ করিয়াছে।

সমস্ত মানব সমাজ বিভ্রান্ত হইয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির সঠিক পন্থা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। পশ্চিম আজ দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতে পারিতেছে না অন্য কিছু নহে, কেবল ইহাই বর্ত্তমানে সঠিক ও "this alone and no other"। তাহারা নিজেরাই অন্ধকারে পথ হাতড়াইতেছে। সুতরাং পশ্চিমের আদর্শ অনুসরণের অর্থ এক অন্ধ কর্তৃক অপর অন্ধের পরিচালনা। এই অবস্থায় আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ইহা কি সম্ভব যে আমাদের সংস্কৃতি বিশ্বকে দিগ্‌দর্শন করিতে পারে?

জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে প্রথমেই সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। কারণ ইহাই আমাদের প্রকৃতি। স্বাধীনতা আমাদের সংস্কৃতির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। যদি সংস্কৃতি ভিত্তি না হয় তবে স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু স্বার্থপর ও সুবিধাবাদীদের আসরে পরিণত হইবে। স্বাধীনতা তখনই অর্থপূর্ণ হয় যখন তাহা আমাদের সংস্কৃতির বিকাশের সহায়ক হয়। এই সংস্কৃতির বিকাশ শুধু আমাদের প্রগতির সহায়ক নয়, ইহা আমাদের আনন্দেরও কারণ হয়। সুতরাং জাতীয় ও মানবীয় উভয় দিক হইতেই আমাদের ভারতীয় আদর্শের কথা বিশেষ ভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। যদি ইহার দ্বারা আমরা

পশ্চিমের বিভিন্ন আদর্শের সমন্বয় সাধন করিতে পারি তবে তাহা আমাদের অধিকতর সার্থকতা দান করিবে। পাশ্চাত্যের এই সকল নীতি মানবীয় বিচার বিপ্লব এবং সামাজিক সংঘাত প্রসূত। এই নীতিগুলি মানুষের কোন না কোন আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। সুতরাং এই সকল চিন্তাধারাকে কখনই উপেক্ষা করা উচিত হবে না।

জাতীয় সংস্কৃতি ঐক্যের প্রতিচ্ছবি

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে তাহা মানব জীবনকে এক পূর্ণরূপে প্রত্য(করিয়াছে। ইহাকে একাত্ম মানববাদ রূপে অভিহিত করা যায়। কোন বিশেষ অঙ্গের কথা বিশেষজ্ঞদের বিবেচনার বিষয় হইতে পারে কিন্তু ইহা সাধারণ জীবনে অপ্রয়োজনীয়। পাশ্চাত্যের বিভ্রান্তির প্রদান কারণ ইহা জীবনকে পূর্ণভাবে না দেখিয়া, আংশিকভাবে বিচার করিয়াছে। এবং পরে তাহার সংযুক্ত(করিয়া এক পরিপূর্ণ মানবের রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছে। আমরা স্বীকার করি যে জীবনে পার্থক্য এবং বিভিন্নতা আছে, কিন্তু আমরা সবর্দা তাহাদের পশ্চাতে যে সামঞ্জস্য বা ঐক্যবোধ বিরাজ করিতেছে তাহাই আবিস্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রচেষ্টা বিজ্ঞানসম্মত। বৈজ্ঞানিকরা সর্বদা বি(েব যে বিশৃঙ্খলা আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় তাহার মধ্যে যে ঐক্য বিরাজ করিতেছে তাহাই আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। যে নীতিতে বি(েজগৎ পরিচালিত হইতেছে তাহা বিবেচনা করিয়াই তাঁহাদের নীতি নির্দ্ধারণ করেন। রাসায়নিকরা আবিষ্কার করিয়াছেন যে কয়েকটি উপাদান সমগ্র পার্থিব জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। পদার্থবিদরা আরও একপদ অগ্রসর হইয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে এই সকল উপদানের মূল কেবল ত্রদ্রত্রন্ত্ববা শক্তি(। আমরা আজ জানিয়াছি যে সমগ্র বি(ে শুধু কতকগুলি ত্রদ্রত্রন্ত্ববা শক্তি(র সমষ্টি।

দার্শনিকরাও মূলত বৈজ্ঞানিক। পাশ্চাত্য দেশের দার্শনিকরা দ্বান্দ্বিক নীতি ূঞ্জহৃদ্রক্ষ্ম ত্বদ্মৎত্র ঃ দুভস্তখভুন্থ্রূ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন। হেগেল থিসিস, অ্যান্টিথিসিস ও সিনথিসিকের নীতি আলোচনা করিয়ছেন। কার্ল মার্কস ডারইউনের মতে (ভস্তুন্তুথৎ দ্র ঠত্র হুঠক্ষ্ম ঠত্রন্স্ঠ বা শুধু শক্তি(শালীরাই বাঁচার অধিকারী। কিন্তু এই দেশে আমরা সমস্ত জীবের মধ্যে মূলগত ঐক্য ল(্য করিয়াছি। এমন কি যাঁহারা সংঘর্ষবাদী তাঁহারও প্রকৃতি এবং মনের মধ্যে সংঘর্ষ অপে(া সমন্বয়ের রূপ প্রত্য(করিয়ছেন। বৈচিত্র্য তাহার অন্তনির্হিত ঐক্যের প্রকাশ। বীজ হইতে মূল, কান্ড, শাখা-প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ও ফল দেখা দেয়। ইহাদের প্রত্যেকটির রূপ ও রং বিভিন্ন। এমনকি তাহাদের মধ্যে গুণগত পার্থক্যও আছে। তথাপি একই বীজ হইতে উদ্ভুত বলিয়া মূলতঃ তাহারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত।

পারস্পরিক সংঘাত সাংস্কৃতিক অবনতির কারণ

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বিকাশ ভারতীয় সাংস্কৃতির প্রধান আদর্শ। এই সত্য যদি সর্বান্তকরণে গৃহীত হয় তবে, বিভিন্ন শক্তি(র মধ্যে সংঘর্ষের অবকাশ থাকে না। সংঘর্ষ

প্রকৃতি ও সংস্কৃতির ল(ণ নহে, ইহা বরং তাহার অবনতির কারণ। জংলী নীতি এই তথ্য— যাহা সম্প্রতি পাশ্চাত্যের লোকে আবিষ্কার করিয়াছে তাহা আমাদের দেশের দার্শনিকগণের অজানা ছিল না।

আমরা লোভ, ত্রে(াধ ইত্যাদিকে (ছয়টি নীচ প্রবৃত্তি) মানুষের অবনতির কারণ বলিয়া মনে করি। আমরা এগুলিকে সভ্য জীবন বা সংস্কৃতির মান হিসাবে কখনই গ্রহণ করি নাই। সমাজে দস্যু তস্কর অবশ্যই আছে। ইহাদের হাত হইতে সমাজকে র(া করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু ইহাদেরই সমাজের মান হিসাবে কখনই মনে করিতে পারি না। দ(ভস্তুন্তুথৎ দ্র ঠত্র হুঠত্রন্স্ঠা জোর যার মুলুক তার ইহা অরণ্যের নীতি। বা সভ্যতা এই নীতির উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে নাই বরং মানুষের জীবনে এই নীতি যত কম প্রযুক্ত(হয় তাহারই চেষ্টা হইয়াছে। যদি আমরা প্রগতি বা উন্নতি চাই তবে আমাদের সমাজ বিবর্ত্তনের ইতিহাস অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে।

পারস্পরিক সহযোগিতা

পৃথিবীতে যেমন সংঘাত ও প্রতিযোগিতা আছে তেমন সহযোগিতাও আছে। বৃ(, লতাদি ও জীবজগৎ পরস্পরকে জীবধারণে সহায়তা করে। আমরা বৃ(াদি হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং আমাদের কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি। এইভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা পৃথিবীতে জীবনধারা অব্যহত রাখিয়াছে। পরস্পরকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য যে বিভিন্ন প্রকার প্রাণের সহযোগিতা তাহার উপলব্ধিই সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'প্রকৃতিকে' সামাজিক উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত করার নামই 'সংস্কৃতি'। কিন্তু যখন ইহা সামাজিক সংঘর্ষের কারণ হয় তখনই তাহা 'বিকৃতি' নামে অভিহিত হয়। সংস্কৃতি প্রকৃতিকে অবহেলা বা অস্বীকার করে না। ইহা বরং প্রকৃতির যে সকল উপাদান এই বি(েজীবনে সামঞ্জস্য বিধানে স(ম তারাই বিকাশ দ্বারা পূর্ণ জীবন গঠনের প্রয়াস পায়। ভ্রাতা, ভগ্নী, মাতা-পুত্র, পুত্র ও পিতার সম্পর্ক স্বাভাবিক। ইহা মানুষ ও জন্তু জানোয়ার সকলের মধ্যেই সমান। জন্তুদের স্মৃতিশক্তি(হীনতার জন্য এই সম্পর্ক (ণস্থায়ী। তাহারা এই সম্পর্কের ভিত্তিতে সভ্যতা বা ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিতে পারে না। কিন্তু মানুষ ইহার ভিত্তিতে সুশৃঙ্খল জীবন গড়িয়া তুলে এবং এই মূল সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়া সমগ্র সমাজকে আত্মীয়তার সূত্রে গ্রথিত করিয়া সহযোগী মনোভাবে উদ্বুদ্ধ করে। এইভাবে বিভিন্ন জীবনমান ও পরস্পরার সৃষ্টি হয়। ভালো এবং মন্দ এই দুইটি সত্য এইভাবেই নির্দ্ধারিত হয়। সমাজে আমরা ভাইদের মধ্যে প্রীতি ও বিদ্বেয় উভয় ভাবই দেখিতে পাই। কিন্তু আমরা প্রীতির ভাবকে ভালো মনে করি এবং ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধি কামনা করি। বিদ্ধেষের ভাব কেহই কখনও সমর্থনীয় মনে করে না। যদি সংঘর্ষ শত্রুতাকে মানুষের মূল সম্পর্কের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যদি ইতিহাসের পর্যালোচনা করা হয় তাহা হইলে বিঘ্ন ঐক্যের আদর্শ স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে।

মা তাহার সন্তানদের লালন পালন করে। মাতৃস্নেহ সর্বাপে(া শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। শুধু এই ভাব হইতেই আমরা সমগ্র মানবজাতির আদর্শ, নীতি ও নিয়মাবলী নির্দ্ধারণ করিতে পারি। কখনও কখনও সন্তানদের প্রতি মাতার নিষ্ঠুরতার ঘটনাও প্রত্য(করা যায় বা স্বার্থপরতার ভাব প্রকট হয়। কোন কোন জন্তু তাহার আত্মাজকে উদরাসাৎ করিয়া (ন্নিবৃত্তি করে। প(ান্তরে বানরী মাতা তাহার সন্তানকে মৃত্যুর পরেও বহুকাল পর্যন্ত বু(বাঁধিয়া রাখে। জীবজগতে উভয় প্রকার আচরণই দৃষ্টিগোচর হয়। সভ্যজীবন ও সমাজের জন্য এই দুই প্রকার আচরণের মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় হইবে? আমরা অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব যে, যে আচরণ দ্বারা জীব বাঁচিয়া থাকে তাহাই সভ্যতার বিকাশের জন্য বরণ করিতে হইবে। মানব প্রকৃতিতে দুই প্রকার প্রবৃত্তিই রহিয়াছে এক ত্রে(াধ ও লোভ, দুই প্রীতি ও স্বার্থত্যাগ। ইহাদের সবগুলিই আমাদের প্রকৃতির অন্তর্গত। ত্রে(াধ ইত্যাদি মানুষকে পশুতে পর্যবসিত করে। সুতরাং যদি আমরা ত্রে(াধকে আমাদের জীবনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করি এবং সেইভাবে আমাদের শক্তি(কে পরিচালিত করিতে চাই তবে তাহা জীবনের সমন্বয়ের আদর্শের অবসান ঘটাবে। এমনকি যদি ত্রে(াধের কারণও ঘটে তথাপি তাহা সংযত করারই চেষ্টা করা উচিত। এইভাবে সংযমই জীবনের মান হিসাবে গৃহীত হইয়াছে ত্রে(াধকে কেহ কখনই বাঞ্ছনীয় মনে করে নাই।

এই বিষয়গুলিই হইল জীবন দর্শনের নীতি। এই নীতি কোন একজন বিশেষ ব্যক্তি(র সৃষ্টি নহে। এগুলি আবিষ্কৃত সত্য। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি(। যদি আমরা একটি প্রস্তর নি(প করি তবে তাহা পুনরায় মাটিতে ফিরিয়া আসে। এই নিয়ম নিউটন কর্ত্তৃক প্রবর্তিত হয় নাই—তিনি এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। যখন তিনি বৃ(হইতে আপিল পড়িতে দেখিলেন তখন তিনি উপলব্ধি করিলেন যে নিশ্চয়ই ইহার মূলে এই কারণ বর্তমান। ঠিক এইভাবেই মানব জীবনে আচরণীয় কতকগুলি নীতি নির্দ্ধারিত হইয়াছেন যাহা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই বর্তমান ছিল, যাহার দ্বারা সমাজ ও সভ্যতা উপকৃত হইয়াছে এবং এইজন্য ত্রে(াধের উপসম ঘটানো প্রয়োজন। এইভাবেই মানবের জীবনাদর্শ রচিত হইয়াছে।

পরস্পরের নিকট মিথ্যা কথা বলিও না—যাহা সত্য বলিয়া জানো তাহাই বলিবে—ইহা একটি নীতি। ইহার উপযোগিতা জীবনের প্রতি পদ(পে অনুভূত হয়। আমরা সত্যবাদী লোককে শ্রদ্ধা করি। আমরা মিথ্যাকথা বলিলে নিজেরাই অসুখী হই। ইহার ভিত্তিতে জীবন চলিতে পারে না—ইহাতে শুধু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

এই সকল সিদ্ধান্তই আমাদের ধর্ম

একই শিশু প্রকৃতিগতভাবে মিথ্যাবাদী নয়, প্রায়ই পিতা-মাতারা শিশুকে মিথ্যা কথা বলিতে প্ররোচিত করে। যখন শিশু কিছু পাইতে চাহে এবং পিতামাহা তাহা না দিতে চাহেন

তখন তাঁহারা উক্ত(দ্রব্যটি সরাইয়া রাখিয়া বলেন যে শিশু যাহা চাহে তাহা অদৃশ্য হইয়াছে। শিশু কয়েকবার বিভ্রান্ত হয় কিন্তু সে শীঘ্রই বুঝিতে পারে যে প্রকৃত অবস্থা কি এবং সেও মিথ্যাকথা বলিতে শিখে। মানুষ স্বভাবতই সত্য কথা বলে। এই সত্য যেমন আবিস্কৃতি হইয়াছে, তেমনই জীবন যাত্রার অপরাপর নীতি নিয়মও একইভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহা কাহারও খেয়াল খুশী মত রচিত হয় নাই। ভারতবর্ষের এই নীতিগুলিরই নাম ধর্ম। যে সকল নীতি জীবনে শৃঙ্খলা, প্রগতি ও শান্তি আনয়ন করে তাহাই এদেশে ধর্ম নামে অভিহিত হইয়াছে। এই নীতি বা ধর্মের কষ্ঠি পাথরে বিচার করিয়া আমরা জীবনকে একাত্ম ও পূর্ণরূপে বি(-ষণ করিতে চেষ্টা করিব।

যখন প্রকৃতিকে নীতি ধর্মের অনুশাসনে পরিচালিত করা হয় তখনই সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। এই সংস্কৃতিই মানব জীবন র(া ও উন্নতির কারণ। ধর্ম এদেশে নিয়ম বা নীতি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইংরাজী "রিলিজিয়ন" ধর্মের সঠিক পরিভাষা নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে একাত্মীভূত জীবন হইল ভিত্তি এবং নীতি ও নিয়ম বা নীতি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ব্যক্তি(র সুখ

আমরা জীবনকে একাত্মরূপে চিন্তা করার সময় শুধু সামাজিক জীবন হিসাবে বিচার করি নাই—ব্যক্তি(গত জীবনেও তাহা প্রত্য(করিয়াছি। সাধারণত কোন ব্যক্তি(কে একজন শারীরিক জীব হিসাবে চিন্তা করা হয়। শরীরিক সুখ ও বিলাসই তাহার সুখ বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু আমরা জানি যে মানসিক উৎকণ্ঠা শারীরিক সুখ নষ্ট করে প্রত্যেক লোকই শারীরিক সুখ লাভ করিতে চায়। কিন্তু যদি কোন লোককে বন্দী করিয়া রাখিয়া উৎকৃষ্ট খাদ্য ও আরামের ব্যবস্থা করা হয় তবে কি সে সুখ হয়? যে কোন সুস্বাদু খাদ্যের সহিত সামান্য কয়েকটি কটু বাক্য মানুষকে আহারের সুখ হইতে বঞ্চিত করে। মহাভারতের একটি ঘটনা বহুবিদিত। যখন ভগবান কৃষ(পণ্ডিতদের দূত হিসাবে হস্তিনাপুরে যান তখন দুর্য্যোধন তাঁহাকে রাজ আতিথ্য গ্রহণে আহ্বান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ(তাঁহার আমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া বিদুরের গৃহে গমন করেন। এই মহামান্য অতিথির আগমনে উল্লাসিত বিদুর পত্নী তাঁহাকে খুদের অন্ন থোড়ের ব্যঞ্জন ভোজন করিতে দিয়াছিলেন। এই কারণেই আগ্রহ সহকারে যদি সামান্য আহার্য্য বস্তু কাহারও সম্মুখে উপস্থাপিত করা যায়, তবে তাহা ঘৃণার সহিত প্রদত্ত রাজভোগ অপে(াও লোকের উপাদেয় মনে হয়। এইজন্য শারীরিক সুখ শুধু নয়—মানসিক সুখের কথাও অনুধাবন করা প্রয়োজন।

এইভাবে চিন্তার সুখ সম্বন্ধেও বিবেচনা করা আবশ্যক। কোন ব্যক্তি(শারীরিক সুখ, প্রাধান্য ও প্রীতি সব কিছুই যদি প্রাপ্ত হয় (যাহাতে মানসিক ও শারীরিক সুখ লাভ ঘটে) , তথাপি তাহার যদি চিন্তাধারায় বিভ্রান্তি থাকে তবে তাহা এক প্রকার মানসিক বিকারের

অবস্থা সৃষ্টি করে। মানসিক বিকৃতি কি? একজন মস্তিষ্কবিকৃত লোক সকল প্রকার শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য, সম্পদ এবং স্নেহে জীবন যাপন করিলেও তাহারা চিন্তা সুখ হইতে বঞ্চিত হয়। চিন্তার শান্তিও একান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের এই সকল বিষয়ই বিবেচনা করিতে হইবে।

মানুষের রাজনৈতিক আকাঙ্খা

একজন ব্যক্তি(র মধ্যে শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মা এই চারিটি বস্তুই বর্তমান। কিন্তু এগুলি একাত্মীভূত। আমরা কোন একটিকে পৃথিক করিয়া চিন্তা করিতে পারি না। পশ্চিমে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে তাহার কারণ এই সকল বিষয় পৃথকভাবে চিন্তা করিয়াছেন ইহাদের পরস্পরের সম্পর্কের কথা তাঁহারা অনুধাবন করেন নাই। যখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দাবীতে আন্দোলন চলিতেছিল তখন তাঁহারা ঘোষণা করিলেন যে ঞ্চথদ্রু ন খ দ্মদ্রভ্থ্ঠত্বথৎ খদ্রুক্ষ্ম দ্বথৎ অর্থাৎ মানুষ একটি রাজনৈতিক জীব। সুতরাং তাহার রাজনৈতিক আকাঙ্খা পূরণ হওয়া প্রয়োজন। কোন শুধু একজন লোক রাজা হইবে এবং বাকী সকলে তাহার প্রজা থাকিবে? প্রত্যেককেই শাসনের অধিকার দাও। এই রাজনৈতিক মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভোটের অধিকার প্রদত্ত হইল। সে ভোটের অধিকার পাইল বটে কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্য কতকগুলি অধিকার খর্ব হইল। তখন প্র(উঠিল, ভোটের অধিকার খুব ভালো কিন্তু খাওয়ার কি হইবে? তাহাদের বলা হল, ''এখন যখন ভোটের অধিকার পাইয়াছ তখন তুমিই তো রাজা। তবে চিন্তা করিতেছ কেন?'' কিন্তু লোক উত্তর দিল, আমি যদি খাদ্য না পাই তবে এই রাজ্য লইয়া কি করিব? আমাদের এই ভোটের অধিকার কোন কাজে লাগিবে? আমাকে আগে (টি দাও'' তখন কার্ল মার্কস আসিলেন এবং বলিলেন 'হ্যাঁ, (টি সর্বাপে(া প্রয়োজনীয় বস্তু। রাষ্ট্র শুধু বড়লোকদের সুতরাং আমাদের (টির জন্য লড়াই করিতে হইবে।'' তাঁহার দৃষ্টিতে মানুষ প্রাথমিক ভাবে শরীরের সমষ্টি—যাহা (টির অভিলাসী।। কিন্তু যাহারা কার্ল মার্কসকে অনুসরণ করিলেন তাঁহারা দেখিলেন যে তাঁহারা না পাইলেন (টি, না পাইলেন ভোটের অধিকার।

অপরদিকে আমেরিকা। সেখানে ভোটের অধিকার ও রুটির প্রাচুর্য্য রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি সেখানে সুখ ও শান্তি নাই। আমেরিকায় আত্মহত্যার ঘটনা এবং মানসিক রোগ সর্বাধিক। বহুলোককে শান্ত করিয়া ঘুম পাড়াইবার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। মানুষ এই নূতন পরিস্থিতিতে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ ভোটের অধিকার পাইয়াছে, (টিও পাইয়াছে তবুও তাহারা সুখ শান্তি পায় না কেন। এখন তাহারা শান্তির নিদ্রা ফিরিয়া পাইতে চায়। বর্তমান আমরিকায় গভীর নিদ্রা একটি দুর্লভ বস্তু। যাঁহারা চিন্তা করেন তাঁহারা উপলব্ধি করেন যে কোথাও কোন ভ্রান্তি আছে—যাহার ফলে জীবনে সকল উৎকৃষ্ট বস্তু লাভ করিয়াও তাহারা অসুখী।

ইহার একমাত্র কারণ এই যে তাহারা পূর্ণ মানবসত্বার কথা চিন্তা করে নাই। আমাদের দেশে আমরা এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা করিয়াছি। এইজনই আমরা বলিতে পারিয়াছিলাম যে মানুষের প্রগতির অর্থ তাহার শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মার পরিতৃপ্তি। প্রায়ই একটি কথা শোনা যায় যে ভারতীয় সংস্কৃতি শুধু আত্মার মুক্তি(র কথাই চিন্তা করিয়াছে। ইহা অপর কোন বিষয় বিবেচনা করে নাই। ইহা ভ্রান্ত ধারণা। আমরা আত্মার কথা চিন্তা করিয়াছি। কিন্তু ইহা সত্য নয় যে আমরা শরীর, মন ও বৃদ্ধির উপর কোন গু(ত্ব আরোপ করি নাই। অন্যেরা শুধু শরীরের উপর গু(ত্ব আরোপ করিয়াছে, সুতরাং আত্মা সম্পর্কে আমাদের বি(-ষণ অপূর্ব ও অতুলনীয়। কখনও হয়তো এই ধারণা হইয়া থাকিতে পারে যে আমরা শুধু আধ্যাত্মিক চিন্তাই করিয়াছি এবং জীবনের অপরাপর উপাদান সম্পর্কে আমরা উদাসীন। একটি অবিবাহিত ত(ণ শুধু তাহার মায়ের কথাই ভাবে। কিন্তু বিবাহের পর সে মাতা ও বধূ উভয়ের কথাই চিন্তা করে এবং তাহাদের উভয়ের প্রতিই যথোচিত কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকে। এখন কেহ যদি বলে যে এই ব্যক্তি(র মায়ের প্রতি ভালবাসা নাই তবে তাহা ঠিক হইবে না। পত্নী প্রথমে শুধু পতিকেই ভালোবাসে কিন্তু সন্তান লাভের পর সে স্বামী এবং সন্তান উভয়কেই ভালবাসে। কখনও কখনও কোন অবিবেচক স্বামী মনে করে যে স্ত্রী তাহাকে সন্তান লাভের পর অবহেলা করিতেছে। কিন্তু ইহা সত্য নহে, যদি ইহা সত্য হয় তবে বুঝিতে হইবে যে সেখানে বিকৃতি ঘটিয়াছে এবং স্ত্রী তাহার কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়াছে।

ঠিক সেইভাবে যখন আমরা আত্মার কথা চিন্তা করা প্রয়োজন মনে করি তখন আমরা শরীরকে অবহেলা করি না। উপনিষদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছে, ''নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য'' অর্থাৎ দুর্বল ব্যক্তি(আত্মার উপলব্ধি করিতে পারে না। অথবা ''শরীর দ্বারাই ধর্ম আচরণ সম্ভব''। আমাদের ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে তাহারা শরীর ও তাহার সন্তুষ্টিকেই আদর্শ জ্ঞান করে এবং আমরা শরীরকে আমাদের ল(্যে পৌঁছিবার উপায় মনে করি। আমরা শরীরের উপযোগিতা বলিতে ইহাই বুঝি। আমাদের দৈহিক সন্তুষ্টি সাধনের প্রয়োজন আমরা অবশ্যই অনুভব করি কিন্তু ইহাকেই কর্তব্যের আদর্শ আমরা সম্মুখে আছে—শরীরের প্রয়োজন পরিপূরণ, হৃদয়ের প্রসার, বুদ্ধির বিকাশ ও আত্মার উন্নতিসাধন। ইহাতেই মানুষ পূর্ণরূপে প্রকটিত হয়। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মো(চারিটি পু(যার্থ বা মানবীয় প্রয়াস। পুরযার্থ অর্থ সেই প্রচেষ্টা যাহা মানুষের উপযুক্ত(। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মো(লাভের আদর্শ মানুষের আজন্ম সংস্কার এবং ইহার পরিপূরণ তাহাকে পরমানন্দ দান করে।

এই চারিটি প্রচেষ্টাকেই আমরা অভিন্নভাবে চিন্তা করিয়াছি। যদিও মো(এই চারিটি প্রচেষ্টার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে তথাপি শুধু মো(লাভের চেষ্টা মানুষের আত্মার প(ে কল্যাণকর বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। প(ান্তরে যে লোক

ফলের জন্য ব্যাকুল না হইয়া কর্মে রত থাকে নিশ্চয়ই সে অতি সহজে মো(লাভ করে।

যাহাকে অর্থনৈতিক নীতি বলা হয় তাহা অর্থের আওতায় আসে। প্রাচীন মত অনুযায়ী বিচার ও শান্তিও ইহার অন্তর্গত। কাম অর্থ বিভিন্ন স্বাভাবিক ইচ্ছার পরিপূরণ, ধর্ম্ম কতকগুলি নীতি ও নিয়মের সমষ্টি, যাহা সামাজিক আচরণ, অর্থ ও কামকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া অভিন্ন ও সুশৃঙ্খল জীবন বিকাশের সহায়ক হয়। ইহার দ্বারা শুধু অর্থ ও সুখই নহে, পরিণামে মো(প্রাপ্তিও সম্ভবপর হয়।

এইভাবে যদিও ধর্ম অর্থ ও কামকে নিয়ন্ত্রিত করে তথাপি এই তিনটি পু(ষার্থই পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত(ও পরস্পরের পরিপূরক। ধর্ম লাভে সহায়তা করে। ব্যবসায়েও সততা, সংযম, সত্যবাদীতা ইত্যাদির প্রয়োজন হয় যাহা ধর্মীয় অনুশাসন মাত্র। এই গুণাবলী না থাকিলে মানুষ অর্থ উপার্জন করিতে পারে না। একজন অধর্ম দ্বারা অর্থ উপার্জন করিতে পারে কিন্তু তাহাতে তাহার অর্থ ও কাম (Money and pleasure) প্রাপ্তি ঘটে না। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে ধর্মই অর্থ ও সুখলাভের উপায়। আমেরিকাবাসীরা ঘোষণা করিয়াছে, Honesty is the best business policy—সত্যই শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীর পদ্ধতি। ইউরোপবাসীরা বলে, Honesty is the best business policy—সততাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। আমরা আরও এক পদ অগ্রসর হইয়া বলিয়াছি, Honesty is not a policy but a Principal–সততা উপায় বা পদ্ধতি নয়—সততা একটি নীতি বা আদর্শ। আমরা এজন্য সেই ধর্মে বি(াস করি না যাহা অর্থ উপার্জনের উপায়। আমরা ধর্মে বি(াস করি এইজন্য যে ইহা সভ্য জীবনের মূলনীতি বা আদর্শ।

কাম বা সুখ লাভের একমাত্র উপায় ধর্ম। সুখাদ্য উৎপাদনের পর তাহা কখন, কোথায়, কেমনভাবে ও কি পরিমাণে দেওয়া উচিত তাহা একমাত্র ধর্মের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইতে পারে। যদি একজন অসুস্থ ব্যক্তি(একজন সবল ব্যক্তি(র খাদ্য গ্রহণ করে বা একজন সুস্থ ব্যক্ত(রোগীর পথ্য আহার করে তবে তাহাতে উভয়েরই অসুবিধা হইতে বাধ্য। ধর্ম মানুষের প্রবৃত্তিকে সংযত করে এবং স্থির করিয়া দেয় যে—ইহা তাহাকে পরিতৃপ্ত নয়—ইহা তাহার উপযোগী হইবে কিনা! এই কারণেই ধর্মকে আমাদের সংস্কৃতিকে সর্বোচ্চ স্থান দান করা হইয়াছে।

ধর্ম একান্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য কিন্তু ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে অর্থ ভিন্ন ধর্মাচরণ অসম্ভব। একটি প্রবাদ আছে যে বুভু(যে, সে সকল প্রকার অন্যায় কার্য করিতে পারে। বি(ামিত্রের মত ঋষিও (ুধার জ্বালায় চণ্ডালের গৃহে চুরি করিয়া কুকুরের উচ্ছিষ্ট মাংস ভ(ণ করিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে সর্বদা অর্থ উৎপাদন করিতে হইবে কারণ অর্থ ধর্ম্মকে শক্তি(শালী করে। ঠিক এই মতই সরকারকে আইন ও শৃঙ্খলা র(া করিয়া উৎশৃঙ্খলতা নিবারণ করিতে

হইবে কারণ উৎশৃঙ্খলতা ধর্ম্মনাশের কারণ হয়। বিশৃঙ্খলা অরণ্যের নীতি আনয়ন করে—যেখানে সকলে দুর্বলকে পীড়ন ও শোষণ করে। সুতরাং রাজ্যের স্থায়িত্ব ধর্ম বা আদর্শ র(ার জন্য অপরিহার্য্য। এজন্য শি(া, চরিত্রগঠন, আদর্শের প্রসার এবং উপযুক্ত(অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়।

সরকারও অর্থের আওতার মধ্যেই আসে। রাজ্যের হস্তে প্রভূত শক্তি(কেন্দ্রীভূত হইলে তাহা ধর্মের বা আদর্শের (তির কারণ হয়। বলা হইয়াছে যে রাজা তাহার প্রজাপুঞ্জের প্রতি অতি কঠোর বা অতিরিক্ত(কোমল হইবেন না। অতি কঠোর নীতির ফলে জনমনে বিদ্রোহের ভাব সৃষ্টি হয়। রাজ্য যখন ধর্মের ন্যায়সহগত অধিকার হরণ করে তখন এই বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই কারণেই অত্যাচারী রাজ্যে ধর্ম্মের অবনতি ঘটে।

যখন রাজ্য রাজনৈতিক ও আর্থিক সমস্ত (মতা গ্রাস করে তখন তাহার পরিণাম ধর্মের অবসান। এইভাবে যদি রাজ্য অমিত শক্তি(র অধিকারী হয় তবে সমাজ সবকিছুর জন্য সরকারের মুখাপে(ী হয়। রাজ্যের কর্মচারীবৃন্দ তাহাদের কর্তব্যে উদাসীন এবং অন্যায়ভাবে অর্থ আহরণে আগ্রহী হয়। রাজ্যের হস্তে প্রভূত শক্তি(কেন্দ্রীভূত হওয়াই এই সকল দুষ্কৃতির কারণ। এইজন্য এই উভয়বিধি উপায়ে অর্থকে প্রাধান্য দেওয়া অনুচিত।

কাম বা সুখ সম্বন্ধেও এইভাবে চিন্তা করিতে হইবে। যদি শারীরিক প্রয়োজন অস্বীকৃত এবং ইচ্ছা সম্পূর্ণ অবদমিত হয় তবে ধর্মের বিকাশ ঘটে না। যদি কেহ অনাহারে থাকে তবে তাহার দ্বারা ধর্ম আচরিত হয় না। যে চা(কলা, যাহা মনকে পরিতৃপ্ত করে, যদি তাহার বিকাশের সুযোগ না থাকে তবে সুসভ্যতার সমাজ সৃষ্টি সম্ভব হয় না। ইহাকে মানসিক বিকার ঘটে ও ধর্ম অবহেলিত হয়। প(ান্তরে যদি রোমের সামন্ততান্ত্রিক লোভ অথবা যথাযথ স্পর্শানুসুখের আকাঙ্খা সমাজে পরিব্যাপ্ত(হয় তবে কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়। সুতরাং ধর্মের সহিত সঙ্গতি করিয়া সুখভোগ করিতে হইবে।

আমরা এইভাবে ব্যক্তি(র জীবন একান্তভাবে বিচার করিয়াছি। আমরা শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মার সমভাবে বিকাশের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছি। মানুষের নানারূপ আশা ও আকাঙ্খা পূরণের চেষ্টাকে সংঘর্ষমূলক বলিয়া আমরা অনুভব করি না। ব্যক্তি(র চার পু(ষার্থ তাহার পূর্ণরূপে বিকশিত হইবার উপায় মাত্র। এই একান্ত মানবতার বিকাশই আমাদের ল(্য।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্যক্তি সমাজ ও জাতি

ব্যক্তি(ত্বের বিভিন্ন দিক আছে এবং ব্যক্তি(র বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন রহিয়াছে। পূর্ণ ব্যক্তি(ত্ব গড়িয়া তুলিবার জন্য তাহার বিভিন্ন চাহিদা সুষ্ঠুভাবে পূরণের উদ্দেশে সমস্ত স্তরে কতগুলি বিশেষ প্রচেষ্টার প্রয়োজন। ইহা অবশই বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু মানুষ শুধু একক ব্যক্তি(নহে। শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মার দ্বারা গঠিত ব্যক্তি(শুধু একটি মাত্র আমি নয়, ইহা সামগ্রিকভাবে 'আমরা'। অতএব আমাদের গোষ্ঠী বা সমাজ সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হইবে।

ইহা অতি সরল সত্য যে সমাজ কতকগুলি ব্যক্তি(র সমষ্টি। কিন্তু কিভাবে এই সমাজের সৃষ্টি হইল? দার্শনিকেরা এ বিষয়ে বহুমত প্রকাশ করিয়াছেন। পাশ্চাত্যে যে সকল মত প্রচারিত তাহা সংক্ষে পে—

অর্থাৎ সমাজ কতগুলি ব্যক্তি(র সমষ্টি যাহা ব্যক্তি(গণের মধ্যে একটি চুক্তি(র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই মতে ব্যক্তি(কে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়। যদি পাশ্চাত্য মতবাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে তবে তাহা এই যে যদি ব্যক্তি(সমাজগঠন করিয়া থাকে তবে কাহার হস্তে প্রকৃত (মতা ন্যস্ত হইবে? ব্যক্তি(না সমাজে? ব্যক্তি(র কি সমাজ পরিবর্ত্তনের অধিকার আছে? সমাজ কি ব্যক্তি(র উপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করিতে পারে? ব্যক্তি(এই সকল প্র্ন সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীন?

ব্যক্তি(বনাম সমাজ

পাশ্চাত্যে এই প্র্নে গু(তর মতভেদ আছে। কেহ কেহ সমাজকে সর্ব(মতার অধিকারী বলিয়া মনে করেন এবং ইহা হইতে একটি সংঘের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃত সত্য ইহাই যে বক্তি(সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এই ধারণা ভ্রান্ত। ইহা সত্য যে সমাজ কতগুলি ব্যক্তি(র সমষ্টি তথাপি ইহা মনুষ্যসৃষ্ট নহে অথবা শুধু কতকগুলি ব্যক্তি(র পরস্পরের সান্নিধ্যের ফলেও ইহা ঘটে নাই।

আমাদের মতে সমাজ স্বয়ম্ভূ! ব্যক্তি(র ন্যায় সমাজের প্রতিষ্ঠাও প্রকৃতিগত। মানুষ সমাজ সৃষ্টি করে না। ইহা কোন কোম্পানী, ক্লাব বা সমবায় সমিতির মত নয়। বাস্তবে সমাজ একটি আত্মসচেতন সত্বা। ইহা ব্যক্তি(র ন্যায় সার্বভৌম (মতার অধিকারী। ইহা একটি প্রাকৃতিক সত্বা। আমরা একথা কখনও স্বীকার করি নাই যে সমাজ একটি যথেচ্ছ রচিত সংস্থা। ইহার নিজস্ব প্রাণ আছে। সমাজেরও শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মা বর্ত্তমান। কিছু কিছু পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদ আজকাল এই সত্য স্বীকার করিতেছেন। ম্যাকডু গাল ''গোষ্ঠিমন'' নামে একটি মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারা প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে গোষ্ঠির একটি নিজস্ব মন, মনস্তত্ত্ব, চিন্তার ধারা এবং বর্ত্তমান আছে।

গোষ্ঠির অনুভূতিও রহিয়াছে। ইহা ঠিক ব্যক্তি(র অনুভূতির মত নহে। গোষ্ঠির অনুভূতি গণিতের নিয়ম অনুযায়ী কতকগুলি ব্যক্তি(র অনুভূতির যোগফল মাত্র একথা কখনই বলা চলে না। গোষ্ঠির শক্তি(ও ব্যক্তি(র সামূহিক শক্তি(নহে। একটি গোষ্ঠির বুদ্ধি, আবেগ, উৎসাহ এবং শক্তি(ব্যক্তি(র গুণাবলী হইতে মূলগতভাবে পৃথক। এই কারণেই অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে একজন দুর্বল ব্যক্তি(তাহার শারীরিক শক্তি(র অভাব সত্ত্বেও সমাজের বীর সন্তানরূপে পরিগণিত হইয়াছে। অনেক সময় কোন ব্যক্তি(তাহাব ব্যক্তি(গত অপমান সহ্য করিলেও গোষ্ঠির প্রতি অপমান সহ্য করিতে পারে না। অনেক ব্যক্তি(তাহার প্রতি ব্যক্তি(গত কটুক্তি(গ্রাহ্য করিলেও তাহার সমাজের প্রতি কটূক্তি(কখনই বরদাস্ত করিবে না। এমনও হইতে পারে যে একজন লোক তাহার ব্যক্তি(গত জীবনে অত্যন্ত সৎ হইলেও সমাজের সভ্য হিসাবে সকল প্রকার অপকর্ম করিতে প্রস্তুত। এইরূপে কোন ব্যক্তি(ব্যক্তি(গত জীবনে অসৎ কিন্তু সামাজিক জীবনে সৎ হইতে পারেন। ইহা একটি গু(ত্বপূর্ণ বিষয়।

আমি আপনাদের একটি উদাহরণ দিব। একবার সর্ব্বোদয় নেতা বিনোবাভেজীর সহিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ং ও সেবক সংঘের নেতা শ্রী গু(জীর কথোপকথনকালে একটি প্র্ন দেখা দিল যে হিন্দু ও মুসলমান চিন্তাধারার পার্থক্য কোথায়? গু(জী বিনোবাভেজী কে বলিলেন যে সকল সমাজেই সৎ ও অসৎ ব্যক্তি(বর্তমান। হিন্দু ও মুসলমান সমাজে বহু সৎ ও ভাল লোক আছেন। ঠিক সেইরূপ উভয় সমাজে গুণ্ডা ও বদমায়েসের অভাব নাই। ভালোতে কোন সমাজেরই একচেটিয়া অধিকার নয়। যাহা হউক যখন কোন হিন্দু গুণ্ডা একটি স্থানে সকলের সহিত মিলিত হয় তখন সে ভাল জিনিসই চিন্তা করে। প(ান্তরে, যখন দুইজন ভাল মুসলমানও সমাজে একত্র হয় তখন তাহারা এমন সকল প্রস্তাব করে বা এমন বিষয় সমর্থন করে যাহা তাহারা বক্তি(গতভাবে কখনই চিন্তাই করিতেন না। ইহা প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা। বিনোবাভেজী স্বীকার করেন যে এই অভিমত মূলতঃ সত্য কিন্তু ইহার কারণ তিনি যুক্তি(দ্বারা বিশ্লে-ষণ করিতে পারেন নাই।

এই অবস্থা বিবেচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে ব্যক্তি(র চিন্তার ধারা এবং সমাজের চিন্তাধারার মধ্যে সর্বদা পার্থক্য রহিয়াছে। এই দুইটির মধ্যে কোন পাটিগণিতের সম্পর্ক নাই। যদি হাজারটি ভালো লোকও একত্রিত হন তবুও একথা বলা যায় না যে তাহারা ভালো কথাই ভাবিবেন।

আজকাল সাধারণ ভারতীয় ছাত্ররা প্রায়ই নম্র ও লাজুক। গত বিশ বৎসর পূর্ব্বের ছাত্রদের তুলনায় তাহারা কৃশ ও দুর্বলতর। কিন্তু যখন এই ছাত্ররা সমবেত হয় তখন অবস্থা গু(তর হইয়া দাঁড়ায়। তখন তাহারা নানা প্রকার দায়িত্বহীন কাজে রত হয়। সুতরাং একটি ছাত্র নিয়মানুবর্তী হইতে পারে, কিন্তু একটি ছাত্রদল বিশৃঙ্খল। ইহাকে ব্যক্তি(গত মনোভাবের পরিবর্তে Mobmentality নামে অভিহিত করা হয়। এটি জীবনের একটি (দ্র দিক।

দার্শনিকত্ব এই যে একটি জনসমষ্টি একত্রে বহুদিন বসবাস করিলে ঐতিহাসিক পরম্পরা ও সাহচর্য্যের ফলে তাহারা একইভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে এবং একই প্রকার রীতি নীতিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে। ইহা সত্য যে একত্র বসবাসের ফলে কতকটা সাদৃশ্য দেখা দেয়। দুইটি সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তি(র মধ্যে সখ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু একটি সমাজ বা একটি জাতি শুধু একত্র বসবাসের ফলে গড়িয়া উঠে না।

কেন অতীতের পরাত্র(মী জাতিগুলি বিনষ্ট হইল?

সকলেই জানেন যে অতীতের বহু জাতির আজ আর কোন অস্তিত্ব নেই। প্রাচীন গ্রীক জাতি আজ লুপ্ত। মিশরীয় সভ্যতাও সেইভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত। ব্যাবিলন ও সিরিয়ার সভ্যতা আজ অতীতের ইতিহাস। এইভাবে বহু জাতি নিশ্চিহ্(হয়ে গিয়াছে। এইসকল দেশের নাগরিকেরা কখনও একত্রে বসবাস করিয়াছে এমন ঘটনা তো ঘটে নাই। ইহার একমাত্র কারণ সেখানে জনগণের মধ্যে এমন পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছিল যাহাতে এই সকল জাতি বিনষ্ট হয়।

গ্রীস আলেকজান্ডার ও হেরোডোটাস, ইউলিসিস ও এরিষ্টোটল, পে-টো ও সত্রে(টিসের জন্মভূমি এবং বর্ত্তমান গ্রীসের অধিবাসীবৃন্দ সেই একই দেশের সন্তান। তাহাদের দেশ কখনও জনশূন্য হয় নাই বা কোন নূতন জাতিও সেখানে বসবাস করে নাই। বর্ত্তমান গ্রীসের অধিবাসীদের পূর্বপু(ষদের সন্ধান করিতে গেলে ২৫০ হইতে ৫০০ পু(ষ অতীতে যাইতে হইবে। তা সত্ত্বেও প্রাচীন গ্রীস জাতি আজ লুপ্ত। এই সকল দেশে নতুন জাতীয়তা গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা কি প্রকারে হইল? একত্র বসবাসের ফলে কোন জাতি গঠিত হয় না। ইজরাইলের ইহুদীরা হাজার বৎসরের অধিককাল তাহাদের স্বদেশ হইতে বিতারিত হইয়া বাহিরের বিভিন্ন জাতির লোকদের সহিত বসবাস করিয়াও তাহাদের জাতীয় সত্বা অ(ুন্ন রাখিয়াছে। অতএব ইহা পরিষ্কার যে জাতীয় প্রেরণার মূল উৎস সম বাসভূমিতে নহে, অন্য কোন কিছুতে নিহিত আছে।

জাতি কাহাকে বলে

এই উৎস মানুষের সম্মুখে উপস্থাপিত ল(্যের মধ্যে নিহিত। যখন কোন জনসমষ্টি একটি ল(্য ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া একটি ভূমিখণ্ডকে মাতৃভূমি বলিয়া মনে করে তখন তাহা একটি জাতিতে পরিণত হয়। শরীরের মধ্যে একটি 'স্ব' বা আত্মা আছে যাহা ব্যক্তি(র সং(প্ত রূপ। শরীরের সহিত আত্মার বিলুপ্তি ঘটিলে মানুষ মৃত বলিয়া পরিগণিত হয়। সেইমত জাতির জীবনেও একটি আদর্শ ও নীতি আছে যাহাকে তাহার আত্মা বলা যাইতে পারে। যদিও মানুষ বারম্বার জন্মগ্রহণ করে বলিয়া বি(াস করা হয় তথাপি নবজাতক একটি পৃথক ব্যক্তি(। একই আত্মা এক দেহ ত্যাগ করিয়া অপর দেহ

গ্রহণ করে(কিন্তু ইহারা পূর্বে ও পরজন্মের দুইটি পৃথক ব্যক্তি(। একটি মানুষের সমাপ্তির অর্থ তাহার শরীর হইতে আত্মার নি^(মণ। শরীরের অপরাপর অংশেরও বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে। জীববিজ্ঞানীরা বলেন যে কয়েক বৎসর পর আমাদের শরীরে নূতন কোষগুলি পুরাতন কোষগুলির স্থলাভিষিক্ত(হয়। যেহেতু আত্মা দেহের মধ্যে বিনাবাধায় অবস্থান করে সেই হেতু দেহ বর্ত্তমান থাকে। এই প্রকার সম্পর্ককে দর্শন শাস্ত্রে Law of Identity নামে অভিহিত করা হয়। এই Identity-র জন্য আমরা কোন বস্তুর উপস্থিতি স্বীকার করি। এই উপল(নাপিতের (ুরের উপমা সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন এক খরিদ্দারের দাড়ি কামাইবার সময় এক নাপিত গর্ব করিয়া বলিতেছিল যে তাহার (ুরটির বয়স ষাট বৎসর। খরিদ্দার বিস্মিত হইয়া প্র(করিল, ''(ুরটির হাতলটি তো খুব চকচকে। তুমি ষাট বৎসর কেমন করে এমন চকচকে করে রাখলে?—নাপিত কৌতুক বোধ করিয়া বলিল, ''তাও কি সম্ভব? হাতলটা ছয় মাস পূর্বে বদল করা হয়েছে।''

খরিদ্দার তখন কৌতুহলী হইয়া উঠিয়াছে। সে প্র(করিল, ''ইস্পাতটি কত দিনের?'' উত্তর হইল, ''তিন বৎসর পূর্ব্বের।'' অর্থাৎ হাতল বদলাইয়াছে, ইস্পাত বদলাইয়াছে, কিন্তু (ুরের পরিচয় বদলায় নাই। ঠিক সেইরকম প্রত্যেক জাতিরও একটি আত্মা আছে। ইহার একটি বিশিষ্ট নাম আছে। জনসঙ্ঘ যে ''সিদ্ধান্ত ও নীতি'' গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে উল্লেখ আছে—ইহার নাম ''চিতি।'' ম্যাকপড্রালের ভাষায়, ''It is an innate nature of a group''–ইহা একটি গোষ্ঠীর নিজস্ব প্রকৃতি। তাই সকল সমাজেরই একটি নিজস্বহ প্রকৃতি বর্তমান—যাহা ঐতিহাসিক ঘটনার পরিণতি নয়।

একটি মানুষ একটি আত্মা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তি(ত্ব, আত্মা ও চরিত্র প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক ভাবে স্পষ্ট। ব্যক্তি(র সকল কর্ম, চিন্তা এবং অনুভূতি দ্বারা ব্যক্তি(ত্ব গঠিত হয়। সেইমত জাতীয় সংস্কৃতি ঐতিহাসিক কারণে ত্র(মাগত পরিবর্তিত হইতে থাকে। সমবাসভূমি, সমগ্রচেষ্টা ও সমইতিহাস ত্র(মশঃ উন্নততম ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে পারে কিন্তু চিতি বা সমাজ চৈতন্যের উপর কোন প্রভাব থাকে না। এই চৈতন্য ময় চেতনাই জাতিকে প্রকৃত সাংস্কৃতিক বিকাশের পথে পরিচালিত করে।

চিতি-সংস্কৃতি-ধর্ম

উদাহরণ হিসাবে মহাভারতের কাহিনীর কথা বিবেচনা করা যাইতে পারে। কৌরবদের পরাজয় এবং পাণ্ডবদের জয় হইয়াছিল। আমরা কেন পাণ্ডবদের আচরণ ধর্মীয় মনে করি? কেন এই যুদ্ধকে শুধু রাজ্য লাভের জন্য যুদ্ধ মনে করি না? যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা

এবং দুর্যোধনের নিন্দা কোন রাজনৈতিক কারণে হয় নাই। কৃষ(ও তাঁহার মাতুল কংসকে হত্যা করিয়াছিলেন। কংস তখন রাজা ছিলেন। ইহাকে বিদ্রোহ আখ্যা না দিয়া কেন আমরা কৃষ(কে অবতার এবং কংসকে অসুর নামে অভিহিত করিয়াছি?

রাম তাঁহার লঙ্কা অভিযানে রাবণের ভ্রাতা বিভীষণের সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। বিভীষণের আচরণকে দেশদ্রোহী না বলিয়া সৎ ও আদর্শ বলা হইল কেন? বিভীষণ তাহার ভ্রাতা এবং দেশের রাজার প্রতি জয়চাঁদের মত বি(্বাসঘাতকতা করিয়াও কেন প্রশংসিত হইয়াছিলেন? ইহার মূলেও তো কোন রাজনৈতিক কারণ নেই।

কোন কার্য্যের ভালো বা মন্দ বিচারের একমাত্র মাপকাঠি চিতি বা সমাজ চেতনা। প্রকৃতির যে গুণাবলী সমাজের প(ে উপকারী তারা সংস্কৃতিতে যুক্ত(হয়। আবার সমাজ চেতনা কল্যাণকর বিবেচিত না হইলে তাহা পরিহার করিতে হয়। সমাজ চেতনা বা চিতি হইল কষ্টি পাথরের মত যাহাতে ঘসিয়া ভালো ও মন্দ নির্দ্ধারিত হয়। এই চিতি বা চৈতন্যের দ্বারা জাতির অভ্যুত্থান ঘটে। সকল জাতির মহান সন্তানদের মধ্যে এই চৈতন্যের বিকাশ ও তদনুযায়ী তাঁহাদের কার্য্য করিতে দেখা যায়।

ব্যক্তি(ও অনেক সময় জাতির চৈতন্য জাগ্রত করার কারণ হয়। এইভাবে ব্যক্তি(তাহার নিজস্ব সত্বা ব্যতীত জাতিরও প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, জাতীয় ল(্যে উপনীত হইবার জন্য যে সকল সংস্থা গড়িয়া ওঠে, ব্যক্তি(তাহারও পরিচালক। জাতি অপে(াও বৃহৎ মানব সমাজেরও সে প্রতিনিধি। সং(েপে বলিতে গেলে ব্যক্তি(র বহু দিক আছে কিন্তু তাহা সংঘর্ষমূলক নহে। ঐক্য ও সামঞ্জস্যের আদর্শ সর্ব্বদা তাহাকে প্রেরণা জাগাইতেছে।

একটি ব্যবস্থা-যাহার মূলে প্রকৃতির পারস্পরিক সহযোগিতা প্রবৃত্তি-যাহা মানব সমাজের বিভিন্ন আদর্শের সামঞ্জস্য সাধন করে।

প্রতিষ্ঠান জাতীয় আশা পূরণের উপায়

ডারউইনের মতে জীবমাত্রেরই বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবস্থা অনুযায়ী গড়িয়া উঠে। আমাদের শাস্ত্রে ইহা একটু অন্যভাবে বলা হইয়াছে যে আত্মা প্রাণের সাহায্যে জীবনধারা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় গঠন করে। যেমন আত্মা এইসকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রচনা করে তেমনই জাতির ল(্য পূরণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। একটি শিল্প বা কারখানার জন্য যেমন গৃহ, যন্ত্রপাতি বিত্র(য় ও উৎপাদন কেন্দ্র এবং ইহা অব্যাহত রাখার জন্য বিভাগ সৃষ্টি হয় তেমনিই জাতির অগ্রগতি ও অস্তিত্ব র(ার জন্যও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রচিত হয়। পরিবার, বর্ণ, গোষ্ঠী (যাহাকে আজ ট্রেড ইউনিয়ন বলা হয়) এই প্রকার প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি বিবাহ ইত্যাদিও তাহাই। পূর্ব্বে বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। পরে কোন ঋষি বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। গু(কূল ও ঋষিকূল এই

প্রকার প্রতিষ্ঠান। ঠিক এই প্রকারের রাজ্যও একটি প্রতিষ্ঠান। জাতি ইহা গঠন করে। পশ্চিমে জাতি ও রাজ্য এক বলিয়া ধরিয়া লওয়ার ফলে নানান সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃতপ(ে জাতি ও রাজ্য এক নহে। পূর্বে সমাজে কোন রাজা ছিল না। ধর্ম্ম আচরণের মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরকে র(া করিতেন।

পরবর্তীকালে বাধা ও বিপত্তি দেখা দেয়। লোভ এবং ত্রে(াধ প্রাধান্য লাভ করে। ধর্মের পতন ঘটিতে থাকে এবং ''জোর যার মুলুক তার'' বা মাৎস্যান্যায়ের উদ্ভব হয়। ঋষিরা এই অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হন। তাঁহারা সকলে ব্রহ্মার নিকট উপদেশের জন্য উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদের নিকট রাজ্যের নিয়ম ও পরিচালন ব্যবস্থা বর্ণনা করেন। ইহা তাঁহার স্বরচিত। এই সময় তিনি মনুকে প্রথম নৃপতির পদ গ্রহণের আদেশ দেন। মনু প্রথম হইতে অস্বীকৃত হন এই কারণে যে রাজা হইলে অন্যান্য অপরাধী ব্যক্তি(কে শাস্তি দিতে হইবে। তাহাদের কারাগারে আবদ্ধ রাখিতে হইবে এবং ইহাতে তাঁহার পাপ হইবে। তখন ব্রহ্মা বলিলেন যে রাজা হিসাবে সমাজের শৃঙ্খলা র(া ও শান্তি স্থাপনের জন্য ধর্মানুযায়ী কর্ত্তব্য করিলে তাঁহার কোন পাপ হইবে না। ইহা তাঁহার কর্ত্তব্য বা ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার প্রজাবর্গ যদি ধর্ম করে তবে তাহাদের সুকর্মের ফলও তাঁহার প্রাপ্য হইবে। যদিও ইহা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয় নাই তথাপি আমার বি(্বাস যে যদি কোন রাজা পাপাচরণ করে বা সমাজে পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তবে তাহার পরিণামফলও রাজাকে সমানভাবে ভোগ করিতে হইবে। শুধু সুকর্মের ফলে রাজার অংশ থাকিবে কিন্তু দুষ্কর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে না ইহা হইতে পারে না। উভয়ই সমানভাবে ভোগ করিতে হইবে। এইরূপ চুক্তি(রাজ্যের প্রতি প্রযোজ্য কিন্তু জাতির (Nation) প্রতি নহে। পশ্চিমে ইহার অবস্থা বিপরীত। তাহাদের মতে সমাজ জাতিরূপে একটি চুক্তি(কিন্তু রাজা স্বর্গীয় অধিকার দাবী করিতে পারে এবং ভগবানের একমাত্র প্রতিনিধি পদে নিজেকে ঘোষণা করিতে পারে। ইহা ভুল। আমাদের দেশে রাজপ্রথা অতি প্রাচীন হইতে পারে কিন্তু সমাজ বা জাতি স্বয়ম্ভুত। রাজ্য জাতির স্বার্থে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। ঠিক এইভাবেই রাষ্ট্রের মত বিভিন্ন সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেকটি ব্যক্তি(এই সকল সংস্থার অঙ্গ বিশেষ। এক বক্তি(তাহার পরিবারের বা গোষ্ঠীর সদস্য। সে পেশায় আরও কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্য হইতে পারে। তদুপরি সে তাহার জাতি বা সমাজের সদস্য। আরও বড় করিয়া দেখিলে সে সমগ্র মানব বা বি(্বের সদস্য। প্রকৃতপ(ে ব্যক্তি(র কোন একক অস্তিত্ব নাই। ব্যক্তি(সর্বদাই বহু। সে অনেক প্রকার জীবন যাপন করে। সর্বাপে(া বড় কথা এই যে তাহার বিভিন্ন ব্যক্তি(ত্ব সত্ত্বেও কাহারও সহিত তাহার সংঘাত নাই। তাহাকে এমনভাবে চলিতে হয় যাহাতে সে পরস্পরের পরিপূরক ও রচনাত্মক কার্য্যে ব্রতী হয়, বিচ্ছেদে বা অহিতকর কার্য্য না করে এই গুণ মানুষের জন্মগত।

যে ব্যক্তি(এই গুণের উপযুক্ত(প্রয়োগ করিতে স(ম সেই সুখী এবং যে তাহা করিতে পারে না সেই অসুখী হয়। এই ব্যক্তি(র জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে না। উদাহরণ স্বরূপ এক ব্যক্তি(তাহার মাতার পুত্র, তাহার পত্নীর পতি, ভগ্নীর ভ্রাতা এবং পুত্রের পিতা। একই ব্যক্তি(পুত্র ও পিতা, পতি ও ভ্রাতা। তাহাকে সকলের সহিত সম্পর্ক অনুযায়ী সুষ্ঠু আচরণ করিতে হয়। যখন কোন ব্যক্তি(তাহা করিতে পারে না তখনই সংঘাত ঘটে। যদি সে একজনকে সমর্থন করে তবে অপরে (ব্ধ হয়। তাহার পত্নীর সহিত ভগ্নীর, পত্নীর সহিত মাতার সংঘর্ষ তাহার ভ্রান্ত আচরণের জন্যই ঘটিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে মন কষাকষি চলিতে থাকে। ব্যক্তি(তখন ব্যথিত হয় কারণ তাহার মাতা ও পত্নীর প্রতি কর্তব্য ঠিকমত স্বীকৃত হয় না। যখন সে এই সংঘাতের অবসান ঘটাইয়া তাহার কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে স(ম হয় তখন সমগ্র পরিবারের সহিত তাহার একান্তভাব বৃদ্ধি পায় এবং সে সার্থকতা লাভ করে।

ব্যক্তি(ও সমাজের মধ্যে সংঘাত নাই

আমরা একথা মানিয়া লইতে পারি না যে ব্যক্তি(র বিভিন্ন ব্যক্তি(ত্বের সহিত সমাজের বিভিন্ন সংস্থার চিরন্তন সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। যদি কোন বিবাদ দেখা দেয় তবে বুঝিতে হইবে যে সেখানে বিকৃতি আছে—ইহা প্রকৃতি বা সংস্কৃতিতে নহে। পাশ্চাতের চিন্তাধারার এইখানেই ভ্রান্ত। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে মাননীয় অগ্রগতির ইতিহাস শুধু সংঘর্ষের ইতিহাস। এই কারণেই তাঁহারা ব্যক্তি(ও রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া বি(্বাস করেন। ঠিক এই ধারণা হইতেই শ্রেণী সংঘর্ষের চিন্তা উদ্ভূত হইয়াছে।

প্রত্যেক সমাজেই, শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকে। আমাদের দেশেও বিভিন্ন বর্ণ ছিল। কিন্তু আমরা কখনও কোন বর্ণের সহিত অপর বর্ণের সংঘাতকে মূলগত বা স্বাভাবিক বলিয়া বি(্বাস করি নাই। আমাদের চতুবর্ণের আদর্শের মধ্যে সেই বিরাট পু(ষের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে কোন সংঘাত ঘটিতে পারে কি? যদি সংঘাত স্বাভাবিক হইত তবে দেহ কখনই টিকিয়া থাকিত না। এই অঙ্গগুলি শুধু একটি অপরের সাহায্যকারীই নয়, ইহা একাঙ্গ এবং অখণ্ডের প্রতীক। বর্ণ সৃষ্টির সময় এই ভাবেই চিন্তা করা হইয়াছিল। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সংঘাত স্বাভাবিক নহে, ইহা প্রকৃতির বিকৃতি।

সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অবনতি বিভিন্ন কারণে ঘটিয়া থাকে। সমাজের আত্মা দুর্বল হইলে সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দুর্বল এবং নি(ি(য় হইয়া পড়ে। কোন একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান কখনও অকর্মণ এমনকি অহিতকর হইতেও পারে। আবার কখনও কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান, কাল ও পরিবেশ অনুযায়ী অধিকতর কার্যকরীরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে ইহার প্রকৃত কার্যকারীতা উপলব্ধি করা যাইবে। কিন্তু এই বিচারের সময় উদার ও সহনশীল হইতে হইবে। এইজন পরস্পর বিরোধী না হইয়া সহযোগিতার আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

রাজা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি বিশিষ্ট বা প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ইহা সর্বোপরি নহে। আধুনিক জগতে বৃহৎ সমস্যার মূল কারণ এই যে, প্রায় সকলেই রাজ্য ও সমাজকে এক বলিয়া মনে করে (অন্ততঃ কার্যত রাজ্যকে সমাজের একমাত্র প্রতিনিধি বলিয়া মনে করা হয়)। রাজ্য এত অধিক (মতাসম্পন্ন হইয়াছে যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির অবনতি ঘটিয়াছে এবং তাহাদের কার্য্য(মতা প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে।

আমরা কখনই রাজ্যকে সমাজের একমাত্র প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করি নাই। আমাদের রাজ্য বিদেশীর পদানত হওয়ার পরেও আমাদের জাতীয় জীবন অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। স্বাধীনতা লোপ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে পারসিক জাতির অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বৈদেশিক শাসন বর্ত্তমান ছিল। পাঠানেরা দিল্লির সিংহাসন দখল করে। তাহাদের পরে আসে তুর্কি, মোঘল ও ইংরেজরা। এতদসত্ত্বেও আমাদের জাতীয় জীবনধারা লুপ্ত হয় নাই। কারণ রাজ্য আমাদের সমাজের জীবনকেন্দ্র ছিল না। যদি রাজ্যকে আমরা প্রধান বলিয়া গণ্য করিতাম তবে বহু পূর্বেই আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত। শিশুদের জন্য রচিত কাহিনীতে বলা যায় যে, দৈত্যের প্রাণ তোতা পাখির মধ্যে থাকে এবং দৈতকে বধ করিতে হইলে পাখিটিকে বধ করিতে হইবে। যে সকল জাতির প্রাণ রাজ্যের মধ্যে নিহিত ছিল, রাজ্যনাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল জাতি ধ্বংস হইয়াছে। প(ান্তরে যে সকল জাতি রাজ্যকে তাহার জীবনকেন্দ্র বলিয়া বি(্বাস করে নাই সেই সকল জাতি তাহার রাজনৈতিক শক্তি(হস্তান্তরিত হইবার পরেও বিনষ্ট হয় নাই।

ইহার একটি খারাপ ফলও ছিল। ডাঃ আম্বেদকর বলিয়াছেন যে, আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি এত শক্তি(শালী ছিল যে আমরা দিল্লির সিংহাসনকেও উপে(া করিয়াছি। আমরা রাজ্য সম্পর্কে সতর্ক ছিলাম না কারণ আমরা মনে করিতাম যে রাজ্যের উপর জাতির জীবন নির্ভর করে না। কিন্তু আমাদের ওই ভুল হইয়াছিল যে যদিও রাজ্যের স্থান সর্বোপরি না হইতে পারে, কিন্তু ইহা প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান তাহা আমরা বিস্মৃত হইয়াছিলাম।

এই কারণেই শিবাজীর গু(রামদাস স্বামী তাহাকে রাজ্য স্থাপনের আদেশ দেন। ধর্মের নিজস্ব শক্তি(আছে(ধর্ম জীবনে অত্যাবশ্যক। শ্রীরামদাসও শিবাজীকে সন্ন্যাস লইয়া ধর্মপ্রচারের ব্রতী করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া তাহাকে শাসন প্রতিষ্ঠার আদেশ দেন। কারণ রাজ্য সমাজের একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কোন কিছুর প্রয়োজনীয়তা বোধ করা এক কথা এবং তাহা সর্ব্বোপরি বলিয়া স্বীকার করা আর এক কথা। এখন প্র(হইতে পারে যে যদি রাজ্য সর্বোচ্চ না হয় তবে সর্বাপে(া প্রয়োজনীয়তা কি? আমাদের এবার এই প্র(বিবেচনা করিতে হইবে।

ধর্ম সমাজকে র(া করে

রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কেন হইয়াছিল এই প্র্ন আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে। একথা কেহই অস্বীকার করবেন না যে রাজ্যের অবশ্যই কোন উদ্দেশ্য বা আদর্শ আছে। তাহা হইলে এই উদ্দেশ্য বা আদর্শকেই সর্বাপে(া প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। কোষাগারের প্রহরীকে কখনই র(ত সম্পদ অপে(া অধিক গু(ত্ব দেওয়া যায় না। সে প্রহরীমাত্র। রাজ্যও নির্মিত হয় জাতি বা সমাজকে র(ার জন্য। রাজ্যের উপর উৎপাদন ও সংর(ণের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল—যাহাকে জাতির আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে। জাতির আদর্শকে চৈতন্য বা ''চিতি'' নামে অভিহিত করা হয়—যাহা ব্যক্তি(র আত্মার সহিত তুলনীয়। যে সকল নীতি একটি জাতির চৈতন্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হয় তাহারই নাম ধর্ম। সুতরাং ধর্মের স্থান সর্বোচ্চ। ধর্ম জাতির আত্মাকে র(া করে। ধর্ম নষ্ট হইলে জাতি বিনষ্ট হইবে। যে ধর্ম পরিহার করে, সে জাতির প্রতি বি(্বাসঘাতকতা করে।

ধর্ম্ম মন্দির বা মসজিদে আবদ্ধ থাকে না। ভগবানের উপাসনা ধর্মের একটি অঙ্গ মাত্র। ধর্ম আরও বৃহৎ। বিদ্যালয় মানে যেমন জ্ঞান নয়, তেমন মন্দির ধর্ম নয়। একটি শিশু নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাইয়াও অশি(ত থাকিতে পারে, সেই প্রকার কোন মন্দির বা মসজিদে নিয়মিত যাতায়াত করিলেও ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ হইতে পারে। ইংরেজিতে বহু ভ্রান্ত অনুবাদের মত ধর্ম্মকে ''রিলিজিয়ন'' বলিয়া বর্ণনা করার ফলে অত্যন্ত অহিতকর বিভ্রান্তিকর সৃষ্টি হইয়াছে।

ধর্ম্ম ও রিলিজিয়ন পৃথক

আমরা একদিকে ধর্ম্মকে রিলিজিয়ন নামে অভিহিত করিয়াছি, পরদিকে ত্র(মবর্দ্ধমান অজ্ঞানতা দ্বারা আমাদের নিজেদের সমাজ ও ধর্মের প্রতি অবহেলা করিয়াছি। পাশ্চাত্যের জীবনপদ্ধতি গ্রহণের অভিলাষই ইংরাজি শি(ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ফলে পাশ্চাত্যের সঙ্কীর্ণ রিলিজিয়নের আদর্শকেই ধর্ম্ম নামে অভিহিত করা হইল। যেহেতু পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এই তথাকথিত রিলিজিয়নের নাম অন্যায় পীড়ন, সংঘর্ষ এবং সংগ্রাম হইয়াছে সুতরাং অনেকেই এইগুলিকেই ধর্মের বি(দ্ধে দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। আমরাও অনুভব করিয়াছি যে ধর্মের নামে যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে। কিন্তু রিলিজিয়নের নামে যুদ্ধ ও ধর্ম্মযুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য আছে। রিলিজিয়নের অর্থ একটি মত, বি(্বাস বা সম্প্রদায়। ইহার অর্থ ধর্ম নহে। ধর্মের অর্থ বিরাট। ইহা জীবনের সকল বিভাগের সঙ্গে জড়িত। ইহা সমাজকে র(া করে—বি(্বকে র(া করে।

কতকগুলি নীতি অস্থায়ী এবং কতকগুলি অধিক কালের জন্য নির্দিষ্ট। কোন সভায় আচরণেরও নীতি আছে। একটি নীতি এই যে আমি বলিলে আপনারা মনযোগ দিয়া শ্রবণ করিবেন। যদি এই নীতি বিস্মৃত হইয়া আপনারা পরস্পরের সহিত কথা বলিতে থাকেন তাহা হইলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। আমাদের সভার কার্য্য অগ্রসর হইবে না।

সে(ত্রে বলা হইবে যে আপনারা ধর্ম আচরণ করেন নাই। কিন্তু এই নীতি সভাস্থলেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু যদি সভার শেষে গৃহে গমন করিয়াও কথাবার্তা না বলেন তবে আপনারা পরিবারবর্গ ডাক্ত(ার ডাকিতে ছুটিবে। সুতরাং সভায় সভার নীতি এবং গৃহে গৃহবাসীর নীতি পালন করিতে হইবে। বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে আলোচনা এবং তাহাদের দার্শনিক ভিত্তি এমন হওয়া উচিত যাহাতে ইহা ধর্মের বৃহত্তর রূপরেখার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। উদাহরণস্বরূপ যখন আমরা একটি রেজিষ্টার্ড সোসাইটি গঠন করি, তখন তাহার আইন কানুন প্রণয়নের অধিকার অবশ্যই আমাদের থাকে। কিন্তু তাহা উক্ত(সোসাইটির গঠনতন্ত্রে পরিপন্থী হওয়া চলিবে না। উক্ত(গঠনতন্ত্রও কিন্তু সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী হইতে হইবে। আবার উক্ত(রেজিস্ট্রেশন এ্যাকট দেশের সাধারণ সংবিধানের অনুবর্তী হইতে হইবে। এককথায় দেশের সংবিধান একটি মূল দলিল, যাহা দ্বারা দেশের সকল আইনকানুন প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রিত হয়। জার্ম্মানিতে সংবিধানের নাম মূল আইন। সংবিধান কি কোন নীতির অধীন নয়। চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে সংবিধানকে কতকগুলি স্বাভাবিক নীতি মানিয়া চলিতে হয়। সংবিধান জাতির উন্নতির জন্য রচিত। যদি দেখা যায় যে ইহার ফলে (তি হইতেছে তবে তাহা সংশোধন করিতে হয়। এই সংশোধনও শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠেরক মতের উপর নির্ভরশীল নয়। মেজরিটি কি সব করিতে পারে? সব সময় কি তাহাদের সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত হয়? না তাহা হয় না। পাশ্চাত্যের একসময় রাজাকে সার্বভৌম (মতার অধিকারী বলিয়া মান্য করা হইত। ইবার পর রাজন্যপ্রথা বাতিল হইলে জনগণকে সর্বশক্তি(মান বলিয়া ঘোষণা করা হইল। আমাদের দেশে কখনও রাজা, জনগণ ও পার্লামেন্ট সার্বভৌম (মতার অধিকারী ছিল না। পার্লামেন্টও যথেষ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারে না।

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সম্বন্ধে বলা হয় যে ইহা যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। শুধু নারীকে পু(ষ বা পু(ষকে নারী করিতে পারে না। কিন্তু পার্লামেন্ট কি এই আইন করিতে পারে যে সকল ইংরেজকে মাথা দিয়া হাঁটিতে হইবে? ইহা অসম্ভব। ইংলন্ডে কি এমন আইন রচিত হইতে পারে যাহাতে প্রত্যেককে স্থানীয় কর্তৃপ(র নিকট নিত্য হাজিরা দিতে? পারে না, তাহারা পরস্পরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। কিন্তু তাহাদের পরম্পরারও বহু পরিবর্তন হইয়াছে যখন কোন রীতি ইংলন্ডের উন্নতির বাধাস্বরূপ মনে হইয়াছে তাহা তখনই পরিত্যক্ত(হইয়াছেও যে নীতিগুলি উন্নতির সহায়ক তারা সংযোজিত হইয়াছে।

ইংলন্ডের মত পরস্পরাকে সর্বত্র শ্রদ্ধা করা হয়। আমাদের লিখিত সংবিধান আছে কিন্তু তাহাও দেশের ঐতিহ্য বিরোধী হইতে পারে না। যদি ইহা আমাদের ঐতিহ্যের পরিপন্থী হয় তবে তাহা ধর্মের আদর্শ পূরণ করে না। যে সংবিধান জাতির উন্নতিবিধান করে তাহাই ধর্মের অনুকূল। এইভাবে আমরা ধর্মকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছি এবং ধর্মই সার্বভৌম (মতার অধিকারী। অন্য সকল সংস্থা, ব্যক্তি(বা শাসকবৃন্দ ধর্ম হইতে শক্তি(সংগ্রহ করেন এবং তাহা ধর্মের অনুবর্ত্তি হইতে বাধ্য।

যদি আমরা আমাদের সংবিধানকে জাতীয় বিকাশের দিক হইতে বিবেচনা করি তবে

ইহা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইবে। আমরা এক জাতি এক সমাজ। এইজন্য আমরা ভাষা, প্রদেশ, বর্ণ, মতবাদ বা তথাকথিত রিলিজিয়নের ভিত্তিতে কাহারও বিশেষ অধিকার স্বীকার করি না—সকলকে সমান মর্যাদা দিই। আমরা সকলেই ভারতের নাগরিক।

পৃথক পৃথক প্রদেশ আছে কিন্তু কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক নাগরিকত্ব বলিয়া কিছু নাই। এই নীতিতেই আমরা কোন প্রদেশের পৃথকীকরণের অধিকার অস্বীকার করিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, রাজ্যের সীমান্ত চিহ্নি(তকরণ এবং তাহার নামকরণের অধিকারও পার্লামেন্টের উপরই ন্যাস্ত। কোন বিধানসভার এ (মতা নাই। এই ব্যবস্থা ভারতের ঐতিহ্য ও জাতীয় আদর্শের অনুযায়ী। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা আমাদের সংবিধানকে যুক্ত(রাষ্ট্রীয় রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছি। ফলে আমরা যাহা নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি কার্য্যত তাহা বর্জন করিতে উদ্যত হইয়াছি। যুক্ত(রাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজ্যের স্বেচ্ছায় যোগদানের নীতি স্বীকৃত এবং ইচ্ছা হইলেই বাহির হইয়া যাওয়ার অধিকারও থাকে। ইহা ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডত্বের আদর্শ বিরোধী। ইহাদে ভারতমাত্রার পবিত্র আদর্শ যাহা জনমনে বিরাজিত তাহা প্রকাশিত হয় না। আমাদের সংবিধানের প্রথমেই লেখা হইয়াছে—Indian i.e. Bharat will be a Federation of States'' অর্থাৎ ইন্ডিয়া বা ভারত বিভিন্ন রাজ্য সমন্বিত যুক্ত(রাষ্ট্র। তাহা হইলে বিহার মাতা, বঙ্গমাতা, পাঞ্জাব মাতা, কানাড়া মাতা, তামিল মাতা প্রভৃতি সকল মাতার সমষ্টি ভারত-মাতা। ইহা হাস্যকর। আমরা প্রদেশগুলিকে এক ভারতমাতার অঙ্গ বলিয়া চিন্তা করি। সুতরাং আমাদের সংবিধানের যুক্ত(রাষ্ট্রের পরিবর্তে এক ভারতরাষ্ট্রের কথা বলা উচিত ছিল।

অখণ্ড রাষ্ট্রের অর্থ এই নয় যে সমস্ত (মতা কেন্দ্রের করায়ত্ব থাকিবে। একটি পরিবারের কর্তার হস্তে সমস্ত (মতা থাকে না। কিন্তু তাহার নামেই সমস্ত কাজ হয়। অন্যান্যদের হস্তেও কার্য্যকরী (মতা থাকে। আমাদের শরীরের কথাই ধরা যাক। সমস্ত শক্তি(কি আত্মার নিকট কেন্দ্রীভূত হয়? সুতরাং অখণ্ড রাষ্ট্রের অর্থ এই নয় যে তাহা যথেচ্ছ ববহার করিবে। প্রদেশগুলিরও বিভিন্ন শাসন (মতার অধিকার থাকিবে। এমন কি প্রদেশের নীচে জনপদগুলিরও উপযুক্ত((মতা থাকিবে। শুধু তাহাই নহে, পঞ্চায়েতগুলিরও নির্দিষ্ট শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন প্রয়োজন। অতীতে আমাদের পঞ্চায়েতগুলি একটি বিশেষ গু(ত্ব লাভ করিয়াছিল। কেহ পঞ্চায়েত প্রথা নষ্ট করিতে পারে নাই। আজকাল আমাদের সংবিধানে কিন্তু পঞ্চায়েতের কোন স্থান নাই। পঞ্চায়েতদের হস্তে প্রকৃতপ(ে কোন (মতাই দেওয়া হয় নাই এবং এগুলির নিজস্ব অস্তিত্বও প্রাদেশিক সরকারের উপর নির্ভরশীল। তাহাদের উপযুক্ত((মতা দান গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবে। এইভাবে শক্তি(র বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব। প(ান্তরে এই সকল প্রতিষ্ঠান ও তাহাদের (মতা অখণ্ড রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত(থাকিবে। এই ব্যবস্থাতেই ধর্ম সুষ্ঠু রূপে আচরিত হইবে।

ধর্মের এই সংজ্ঞা শুধু জাতি ও রাষ্ট্র নহে, সমগ্র মানব প্রকৃতি বি(ে-ষণে ব্যবহৃত হইতে পারে। এক কথায় একটি জাতির সংবিধান প্রাকৃতিক নীতির বি(দ্ধাচারী হইতে পারে না। এমন কতগুলি আচরণবিধি আছে যাহা কোন আইনের পুস্তকে বা সংবিধানে লেখা থাকে না। তথাপি পিতাকে ভক্তি(করা হয়, যাহারা তাহা করে না তাহাদের নিন্দা করা হয়। কোন বিচারকালে আইনে লেখা না থাকিলেও বিচারক এই রায় দিলেন যে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত পুত্রকে পিতামাতার সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে হইবে এবং তাহাদের ভক্তি(করিতে হইবে।

এইভাবে সাধারণ মানবীত নীতি বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের ব্যবহারের যৌক্তি(কতা বা অযৌক্তি(কতা নির্দ্ধারণ করে আমরা এই নীতিকেই ধর্ম বলি। ধর্মের নিকটতম পরিভাষা হইতে পারে 'Innate Law' যদিও ইহাতে ধর্মের পূর্ণ অর্থ পরিস্ফুট হয় না। যেহেতু ধর্মের স্থান সর্বোচ্চ সেইজন আমাদের রাষ্ট্রের আদর্শ ধর্মরাজ্য। পূর্বে অভিষেককালে রাজাকে তিনবার উচ্চারণ করিতে হইত ''এমন কেহ নাই যে আমাকে শাস্তি দিতে পারে।'' এই প্রকার দাবী ইউরোপের রাজারাও করিতেন এবং বলিতেন যে রাজা কোন অন্যায় করিতে পারে না। এই কথা উচ্চারণের পর পুরোহিত রাজার পৃষ্ঠে একটি যষ্ঠি দ্বারা আঘাত করিয়া বলিতেন, ''না, তুমি সর্বশক্তি(মান নহ, তুমি ধর্মের অধীন।'' রাজা তখন যজ্ঞস্থল পরিত্র(মা করিতেন এবং পুরোহিত তাহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে করিতে তাহার পশ্চাতে চলিতেন। তিনবার প্রদ(ণের পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইত। এইভাবে রাজাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হইত যে তুমি শক্তি(র উর্দ্ধে নহ। রাজার উপরেও ধর্মের স্থান স্বীকৃত হইত।

জনসাধারণ কি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে? বলা হইতে পারে যে হ্যাঁ—গণতন্ত্রের তাহাই অর্থ। জনগণ যাহা ইচ্ছা করিলেও ধর্ম নীতির বি(দ্ধাচারণ করিতে পারে না। একদিন এক পুরোহিতকে প্র(ে করা হইল যে ভগবান যখন সর্বশক্তি(মান তখন কি তিনি ধর্মের বি(দ্ধাচারণ করিতে পারেন? যদি তাঁহার সে অধিকার থাকে তবে তিনি সর্বশক্তি(মান কিরূপে? ইহা জটিল প্র(ে। প্রকৃতপ(ে ঈ(রেও ধর্মের বি(দ্ধাচারণ করিতে পারেন না? যদি তাঁহার সে অধিকার থাকে তবে তিনি সর্বশক্তি(মান কিরূপে? ইহা জটিল প্র(ে। প্রকৃতপ(ে ঈ(রেও ধর্মের বি(দ্ধাচারণ করিতে পারেন না। অধর্ম দুর্বলতার প্রতীক-শক্তি(র পরিচায়ক নহে। যদি অগ্নির দাহিকাশক্তি(না থাকে তবে তাহা নির্বাপিত হয়, তাহার কোন শক্তি(থাকে না। শক্তি(র পরিচয় যথেচ্ছ আচরণ নয়, শক্তি(র পরিচয় সংযমে। অতএব সর্বশক্তি(মান ঈ(রের স্বসংযত ও ধর্মের অনুগত। ভগবান মানবদেহ ধারণ করেন অধর্মের বিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে(শুধু খেয়ালখুশী চরিতার্থ করিবার জন্য নহে। সুতরাং বলা যায় যে ধর্ম ঈ(রের অপে(ও বড়। বি(েজগত জীবিত থাকার কারণ তিনি ধর্ম অনুযায়ী কর্ম করেন। রাজাকে বিষু(র অবতার মনে করা হইত কারণ তিনি ধর্মরাজ্যের প্রধান র(ক।

ধর্মরাজ্যের অর্থ Theocratic State নহে

ধর্মরাজ্যের অর্থ Theocratic State বা সম্প্রদায়বাদী রাষ্ট্র নহে। আমাদের এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে হইবে। যেখানে কোন সম্প্রদায় ও তাহার গু(বা প্রবর্ত্তক সর্বোচ্চ (মতার অধিকারী—তাহা সম্প্রদায়বাদী রাষ্ট্র। সমস্ত অধিকার এই বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরই সেখানে থাকে। সেখানে অপর সম্প্রদায়ের লোক বাস করিতে পারে না বা করিলেও ত্রীতদাসের ন্যায় জীবন যাপন করে। পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের এই ভিত্তিই ছিল। খিলাফতের পশ্চাতেও এই আদর্শই বর্তমান। সমস্ত পৃথিবীতে মুসলমান রাজারা খলিফার নামে রাজ্য শাসন করিয়াছেন। এখন আবার এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা হইতেছে। সাম্প্রতিক সম্প্রদায়বাদী রাষ্ট্র পাকিস্তান। তাহারা নিজেদের ইসলামিক রাষ্ট্র বলে। সেখানে মুসলমান ব্যতীত সকল সম্প্রদায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। এতদ্ব্যতীত সেখানে কোন ইসলামীয় ল(ণ নাই। কোরাণ, মসজিদ, রোজা, নামাদ ও ঈদ ইত্যাদি ভারত ও পাকিস্তানে একই। রাষ্ট্রের সহিত উপাসনা পদ্ধতির কোন সম্পর্ক নাই। ইহাতে ব্যক্তি(র কোন বিশেষ উপকার হয় না, শুধু রাষ্ট্র তাহার দায়িত্ব এড়াইয়া যায়। ধর্মরাজ্যে ইহা সম্ভব নহে। সেখানে উপাসনার অধিকার স্বীকৃত। সম্প্রদায়বাদী রাষ্ট্রে বিশেষ সম্প্রদায়ের উপাসনা পদ্ধতির অধিকার ও সুযোগ থাকে এবং অপর সকল সম্প্রদায়ের উপাসনা পদ্ধতির উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। ধর্মরাজ্য শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধির জন্য সকল উপাসনা পদ্ধতি মানিয়া চলে। সুতরাং রাষ্ট্রের পরিবেশ এমন হওয়া প্রয়োজন যে প্রত্যেক ব্যক্তি(তাহার (চি অনুযায়ী শান্তিতে জীবনযাপন করিতে স(ম হয়। এজন্য সহনশীলতা প্রয়োজন। প্রত্যেকের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ। আমার হাত নাড়িবার অধিকার আছে কিন্তু যখনই আমার হাতের সহিত কাহারও নাকের সংঘর্ষ ঘটে তখনই হাত নাড়িবার অধিকার সঙ্কুচিত হয়। যেখানে অপর বক্তি(র অধিকার খর্ব হয় সেখানেই আমার অধিকারের সমাপ্তি। এইভাবে উপাসনা পদ্ধতির বাঁচিবার অধিকার আছে। ধর্মরাজ্য উপাসনার স্বাধীনতা (ধর্মীয় স্বাধীনতা) স্বীকার করে কিন্তু কোন উপাসনার অধিকার (ুণ্ণ করে না।

আজকাল ''সেকুলার রাষ্ট্র'' কথাটি সম্প্রদায়বাদী রাষ্ট্রের বি(দ্ধে পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা পাশ্চাত্য চিন্তার অনুকরণের পরিণতি। আমাদের এই শব্দ আমদানীর কোন প্রয়োজন ছিল না। আমরা পাকিস্তানের সহিত পার্থক্য বুঝাইবার জন্য সেকুলর শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। ইহার ফলে কতকটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। রিলিজিয়নকে ধর্মের পর্যায়ে ফেলার পরে সেকুলার রাষ্ট্রের অর্থ ধর্মবিচ্যুত রাষ্ট্র বলিয়া মনে করা হইতেছে। কেহ কেহ বলেন যে আমাদের রাষ্ট্র ধর্মহীন রাষ্ট্র। কেহ কেহ আবার সুন্দর করিয়া বলিবার চেষ্টা করেন যে, ইহা ধর্ম্ম নিরপে(রাষ্ট্র। কিন্তু এই সকল শব্দই ভ্রমাত্মক। কারণ রাষ্ট্র কখনই ধর্ম্মহীন বা ধর্ম্ম উদাসীন হইতে পারে না—যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি(না থাকিলে তাহা অগ্নি থাকে না।

যে রাষ্ট্র মূলতঃ ধর্মর(ার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে তাহা ধর্মহীন বা ধর্মনিরপে(কিরূপ হইতে পারে? যদি ইহা নিঃধর্মী হয় তবে তাহা নীতিহীন বা এবং সেখানে নীতি নিয়ম নাই, সে রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্ব থাকে না। অর্থাৎ ধর্মনিরপে(তা বা ধর্মহীনতার আদর্শ ও রাষ্ট্রের আদর্শ স্ববিরোধী। রাষ্ট্র ধর্মরাজ্য ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। অন্য যে কোন ব্যাখ্যা রাষ্ট্রগঠনের যুক্তি(ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিরোধী হইবে।

বর্ত্তমানে এক বাদানুবাদ সৃষ্টি হইয়াছে—পার্লামেন্ট সর্বশক্তি(মান না সুপ্রীম কোর্ট সর্বশক্তি(মান? বিধানসভা বড় না বিচারালয় বড়। দ(ণ হস্ত বড় না বাম হস্ত বড় এই প্রকার সার তর্ক মাত্র। ন্যায়ালয় ও বিধানসভা উভয়ই রাজ্যের দুইটি অঙ্গ। উভয়েই বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। তাহাদের নিজস্ব(ত্রে উভয়েই প্রধান। ইহাদের দুইটির মধ্যে কে বড় ও কে ছোট বিচার করিবার চেষ্টা ভ্রান্তিমাত্র। বিধানসভা যে নীতি ও ন্যায় প্রবর্ত্তন করেন, ন্যায়ালয় তাহা ব্যাখ্যা করে। প্রকৃতপ(উভয়েরই অধিকার সমান। উভয়েই সংবিধানের অধীন এবং ধর্ম সংবিধানের মূলভিত্তি। তাহাদের উভয়কেই ধর্ম অনুযায়ী কর্ম করিতে হইবে। কেহ কেহ বলিলেন যে জনগণ সর্ব(মতার অধিকারী কারণ তাহারা নির্বাচন করে। কিন্তু লোকে কি ধর্ম্ম ও নীতির বি(দ্ধে যাইতে পারে? যদি কোন সরকার অধর্ম আচরণকারীকে শাস্তি না দেয় তবে তাহা চোরের সরকার। কল্পনা ক(ন যে যদি কোন প্রকারে চোরেরা (মতালাভে স(ম হয় এবং একজন চোরকে শাসন নিযুক্ত(করে তবে কি হইবে? তখন সংখ্যালঘুদের কর্ত্তব্য কি? অবশ্যই তাহাদের এই বহু মতে নির্বাচিত চোরের রাজত্বের অবসান ঘটাইতে হইবে।

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলার ফ্রান্স আত্র(মণ করেন এবং ফরাসীরা নাৎসি বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করিতে পারেন নাই। তখন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী মার্শাল পেতা আত্মসমর্পণ করিলেন এবং ফরাসী জনসাধারণ এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিল। কিন্তু জেনারেল দ্য গল লন্ডনে পালাইয়া আসিলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে তিনি এই পরাজয় স্বীকার করেন নাই। লন্ডনে বসিয়া তিনি নির্বাসিত ফরাসী সরকার গঠন করিলেন এবং ঘটনাত্র(মে ফ্রান্সে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিলেন। এখন যদি বহুমতের সিদ্ধান্ত মানিতে হয় তবে তো দ্য গলের কার্য্য নিন্দনীয় ছিল। তাঁহার স্বাধীনতার সংগ্রামের তবে তো কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু দ্য গলকে কেহ অনধিকারী বলিতে পারে নাই কারণ তিনি ফরাসী জাতির স্বাধীনতার যে মূলনীতি সেখান হইতে এই অধিকার লাভ করিয়াছিলেন এবং জাতির এই মূলগত অধিকার Majority Public Opinion বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের অনেক উর্দ্ধে।

আমাদের দেশেও অধিকাংশ ভারতবাসী ইংরাজের বি(দ্ধাচারণ করে নাই-সামান্য কিছু সংখ্যক লোক করিয়াছিলেন। লোকমান্য তিলক ঘোষণা করিলেন 'Freedom is my birthright' স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার। আজকাল কেহ কেহ বলেন ''গোয়ার ভারতভুক্তি(গণভোট দ্বারা নির্ধারিত হউক। কাশ্মীরে জনমত গ্রহণ করা হউক।'' ইহা অন্যায়। জাতীয় সংহতি আমাদের ধর্ম। এ সম্পর্কে কাহারও অন্য কোন

মত প্রকাশের অধিকার নাই। বহু মতে কে কিভাবে দেশ শাসন করিবে তাহা নির্দ্ধারিত হইতে পারে কিন্তু সার্ব্বভৌমত্ব বা দেশের অখণ্ডত্ব বহুমতের অপে(া করে না।

আপনারা সকলেই জানেন যে আমেরিকা যুক্ত(রাষ্ট্র যেখানে সকলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শপথ গ্রহণ করেন, সেখানে আব্রাহাম লিংকন একবার ভ্রান্ত জনমত স্বীকার করেন নাই। যখন দাসপ্রথা উচ্ছেদের প্র্ে দ(ণী রাজ্যগুলি যুক্ত(রাষ্ট্র হইতে সরিয়া যাইবার সিদ্ধান্ত করিল তখনও লিংকন দৃঢ়ভাবে বলিলেন গণতন্ত্রে তোমাদের পৃথক হইবার কোন অধিকার নেই। এ বিষয়ে তিনি কোন আপোষ করেন নাই। তিনি তাহাদের পৃথক হইতে দিলেন না এবং দাসপ্রথাও সহ্য করিলেন না। তিনি তো আপোষ হিসাবে আংশিক দাসপ্রথা চালু রাখিবার কথা বলিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহার পরিবর্ত্তে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিলেন যে দাসপ্রথা আমেরিকান জাতির ঐতিহ্য ও ধর্মের বিরোধী অতএব তাহার অবসান ঘটাইতেই হইবে। তিনি গৃহযুদ্ধে রত হইলেন কিন্তু অধর্মের সহিত সন্ধি করিলেন না।

ইহা অনেকটা আমাদের দেশের প্রাচীন হিন্দু বিবাহের অনুরূপ। বিবাহিত স্বামী বা স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার ছিল না। এমন কি উভয়প(একমত হইলেও বিচ্ছেদের অধিকার লাভ করিত না। আদর্শ এই ছিল যে তাহাদের আচরণ তাহাদের ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে না, নীতি বা ধর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। যদি কা(্মীরের চল্লিশ ল(মুসলমান বলে যে তাহারা পৃথক হইতে চাহে, যদি গোয়ার লোকেরা বলে যে তাহারা বিচ্ছেদ চায়, যদি তাহারা বলে পর্তুগীজরা ফিরিয়া আসুক তবে তাহা স্বীকৃত হইবে না কারণ ইহা ধর্মের পরিপন্থী। যদি ভারতের ১২৫ কোটি লোকের মধে ১২৪ কোটি ৯৯ ল(৯৯ হাজার ৯৯৯ জন লোকও এমন কাজ করে যাহা ধর্মবিরোধী— তাহা হইলে সেই কার্য্য সত্য হইবে না। প(ান্তরে একজন লোকও যদি ধর্মপথে থাকে তবে তাহারই আচরণ সত বলিয়া স্বীকৃত হইবে। সেই একজন লোকের কর্তব্য হইবে—অন্যান্য লোকদের ধর্ম বা ন্যায়াচরণে প্রবুদ্ধ করা।

ধর্ম বহু মতের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। ইহা সনাতন চিরন্তন (Eternal)। সুতরাং গণতন্ত্রের যে ব্যাখ্যা অর্থাৎ ইহা জনগণের সরকার তবে তাহাই যথেষ্ট হইবে না— ইহাকে জন-কল্যাণকারী হইতে হইবে। লোকের কিসে কল্যাণ হইবে তাহা ধর্ম দ্বারাই নিরূপিত হইতে পারে। গণতন্ত্রে যে বর্ণনা ''Government of the people, for the people, by the people'' ইহার মধ্যে of অর্থ স্বাধীনতা, by অর্থ গণতন্ত্র এবং for অর্থ ধর্ম। অতএব প্রকৃত গণতন্ত্র তাহাই যেখানে স্বাধীনতা এবং ধর্মবিরাজিত এই আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রকৃত পরিভাষা-ধর্মরাজ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

রাজ্য ধর্ম্ম ও ধর্মরাজ্য

ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী জাতি ব্যক্তি(র সমষ্টিমাত্র নহে—ইহা স্বয়ম্ভু ইহা কেহ গঠন করে নাই। জাতি আবার তাহার প্রয়োজন পূরণের জন্য এবং তাহার মূল প্রকৃতির বাস্তব রূপদানের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে। রাজ্য এই সকল প্রতিষ্ঠানের অন্যতম এবং যদিও তাহার প্রয়োজন অত্যধিক তথাপি ইহা সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী নহে। আমাদের সাহিত্যের যেখানেই রাজার কর্তব্যের কথা বলা হইয়াছে সেখানেই রাজার কর্তব্যের কথা বলা হইয়াছে সেখানেই তাঁহার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত(করা হইয়াছে। ইহা সম্ভবতঃ তাহার অসীম দায়িত্ব উপলব্ধির জন্য করা হয়। প্রজাবর্গের জীবন ও চরিত্র নির্ধারণে রাজার বিশেষ প্রভাব থাকে। সুতরাং তাহার নিজস্ব আচরণ সম্পর্কে সচেতন থাকা অত্যাবশ্যক। মহাভারত পিতামহ ভীস্ম এই কথাই বলিয়াছেন। তাহাকে প্র(ে করা হইয়াছে যে রাজা পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণ। আজকাল কেহ কেহ ইহা এইভাবে ব্যাখ্যা করে যে রাজা সর্ববিষয়ের উর্দ্ধে। কিন্তু ইহা সত্য যে ধর্মের উপরে রাজার স্থান। রাজা ধর্ম ও সমাজের র(ক হিসাবে অসীম শক্তি(র অধিকারী, কিন্তু তিনি ধর্ম অনুযায়ী কর্ম করিতে বাধ্য। তাহার স্থান বর্তমানের শাসনকর্তাদের অনুরূপ।

বর্তমানে রাজ্যে শাসনকর্তারা আইন অনুযায়ী শাসনের অধিকারী, কিন্তু তাহারা আইন প্রণয়নের অধিকারী নহেন। যখন শাসনকর্তারা সততা ও যোগ্যতার সহিত কার্য করেন না তখন আইন অবহেলিত হয়। আজকাল এই অবস্থাই ঘটিতেছে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে বর্তমানের নানা সমস্যা সৃষ্টির কারণ এই শাসকবর্গ। মদ্যপান নিষেধ-বিধি কেন কার্যকর হয় নাই? যে ব্যক্তি(দের উপর এই আইন প্রয়োগের দায়িত্ব তাঁহারাই যখন উৎকোচের বশীভূত হন তখন তাহা কার্যকরী করা যায় না। ভীষ্মের উক্তি(র অর্থ ইহাই। ইহাকে রাজা সর্বশক্তি(মান এইভাবে বাখ্যা করা অনুচিত। যদি তাহাই হইত তবে ঋষিগণ অত্যাচারী রাজা রেণুকে অপসারণ পূর্ব্বক পৃথুকে রাজা করিয়াছিলেন কিরূপে? ঋষিদের এই কার্য্য সর্বজন সমাদৃত হইয়াছে। অধর্মচারী রাজাকে পদচ্যুত করার অধিকার ঋষিরা ধর্মের নিকট লাভ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্যদেশে রাজা হয় অন্য রাজা কর্তৃক অপসৃত হয়ে অথবা জনগণ তাঁহার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। কিন্তু সেখানে রাজাকে ভগবানের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করা হয় ও নীতিগতভাবে তাহাকে অপসারণের অধিকার কাহারও নাই।

আমাদের সমাজে রাজনীতিতে রাজ্য বা রাজাকে কখনই সর্বপ্রধান বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। সেখানে রাজা ব্যতীত আরও অনেক প্রতিষ্ঠান ছিল। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান আঞ্চলিক এবং জীবিকা অনুযায়ী সংগঠিত হইয়াছিল। আমরা পঞ্চায়েত ও জনপদ

সভার প্রবর্তন করিয়াছিলাম। মহাশক্তি(শালী রাজারাও পঞ্চায়েতগণকে বিব্রত করেন নাই। ঠিক এই মত ব্যবসায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান গঠিত ছিল। তাহাদের উপরেও হস্ত(প করিত না। তাহাদের স্বায়ত্ব শাসনাধিকার সর্বদা স্বীকৃত হইত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, শ্রেণীর, নিগমের, গ্রামের ও জনপদ সভার নিজস্ব পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল। তাঁহারই নিজ নিজ প্রয়োজনে নীতি বা অনুশাসন প্রবর্তন করিতেন। রাজার কর্তব্য ছিল যে লোকে যাহাতে এই সকল নিয়মকানুন বা অনুশাসন মানিয়া চলে তাহার প্রতি ল(্য রাখা। রাজ্য কখনও এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে হস্ত(প করিত না। এইভাবে রাজ্য শুধু সমাজ জীবন অব্যাহত রাখার জন্য নিযুক্ত(থাকিত।

এইভাবে অর্থনৈতিক (ে ত্রেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয়। আমাদের এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল, যাহা আমাদের মনুষ্যোচিত গুণাবলী, সভ্যতা তথা পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য গঠিত হইয়াছিল। আমাদের ধারণা জীবনে ত্র(মাগত উন্নতির ফলে সম্পূর্ণতা ও ঈ(ের প্রাপ্তি হয়। আমাদের অর্থনীতি কিভাবে এই আদর্শ পূরণ করিতে পারে আমরা এইবার সেই আলোচনা করিব।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা ব্যক্তি(র র(ার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদন ও জাতির সংর(ণ হওয়া আবশ্যক। ন্যূনতম প্রয়োজন মিটিবার পরে স্বভাবতই এই প্র(ে আসে যে তাহাদের অধিকতর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আরও অধিক উৎপাদন উচিত কিনা? পাশ্চাত্য জগৎ ইহা অত্যাবশ্যক মনে করে এবং ত্র(মাগত মানুষের প্রয়োজন ও আগ্রহ বৃদ্ধির চেষ্টা করে। স্বাভাবিকভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন হয়। কিন্তু বর্তমানে ইহা ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। যে সকল বস্তু উৎপাদিত হইতেছে তাহা প্রাপ্তির জন্য জনমনে অধিকতর আকাঙ্খা জাগ্রত করার প্রয়াস দেখা যাইতেছে। যদি চাহিদা নাও থাকে তথাপি চাহিদা বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাই বর্তমানে পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ চায়ের ব্যবহারের কথা ধরা যাক। চা ব্যক্তি(র প্রয়োজনে উৎপাদিত হয় নাই কিন্তু চা উৎপাদন করা হইয়াছে এবং আমাদের চা পানের আগ্রহ সৃষ্টি করা হইয়াছে। বর্তমানে ইহা সাধারণ মানুষের পানীয়। বনস্পতি সম্পর্কেও ঠিক এই কথাই বলা যায়। কেহ কি ইহা চাহিয়াছিল? ইহা প্রথমে উৎপাদিত হইল এবং তাহা আমরা ব্যবহার করিতে শিখিলাম। যদি কোন কিছু উৎপন্ন হয় এবং তাহার চাহিদা না থাকে তবে মন্দার ভাব দেখা যাইবে। আমাদের অনেকের ১৯৩০-৩২ এর কথা স্মরণ আছে। সেই সময় প্রচুর দ্রব্য উৎপাদন হয় কিন্তু সেই অনুপাতে চাহিদা ছিল না। ফলে বহু কারখানা বন্ধ হইয়া যায়। বহু ব্যবসায়ে লাল বাতি জ্বলে এবং সর্বত্র বেকার সমস্যা দেখা দেয়। সুতরাং বর্তমানে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা বিত্রি(ত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

ইংরাজি সাপ্তাহিক Organizer পত্রিকার সম্পাদক কিছুদিন পূর্বে আমেরিকা গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া একটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সেখানে আলুর খোসা

ছাড়াইবার যন্ত্র প্রস্তুতকারী একটি কারখানা আছে। এই কারখানার উৎপাদন চাহিদার তুলনায় অত্যাধিক হওয়ায় কারখানার কর্তৃপ(বিব্রত হইয়া পড়েন। অধিক চাহিদা সৃষ্টির জন্য তাঁহাদের একজন বিক্রে(তা একটি অভিনব প্রস্তাব দেন। ইহাতে যন্ত্রগুলির হাতলের রং আলুর খোসার মত করিবার উপদেশ দেওয়া হয় যাহাতে খোসার সহিত ভ্রমক্র(মে এই যন্ত্রগুলিও আস্তাকুঁড়ে ফেলার সম্ভাবনা থাকে। ইহাতে আরও চাহিদা বাড়িবে এই ছিল তাঁহার যুক্তি(। এইভাবে মোড়কগুলি অধিকতর আকর্ষণীয় করার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু অর্থনৈতিক কাঠামো শুধু কোন দ্রব্য ব্যবহারের উপর গড়িয়া উঠে না—ইহার ফলে আর্থিক কাঠামো ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ব্যক্তি(র প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের পরিবর্তে অধিকতর চাহিদা সৃষ্টি বর্তমান অর্থনীতির আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সীমাবদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে চিন্তা করার প্রয়োজন কারণ সেখানে প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের সহিত অপরাংশের পারস্পরিক সম্পর্ক রহিয়াছে। যদি তিনটি কাঠি একত্রে দাঁড়াইয়া থাকে তবে তাহার কোন একটি সরাইয়া লইলে অপর দুইটির পতন অনিবার্য্য। বর্তমান অর্থনৈতিক পদ্ধতি ও উৎপাদন দ্রুতগতিতে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করিতেছে। ফলে একদিকে যেমন ক্র(মবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য নব নব দ্রব্য উৎপাদিত হইতেছে, তেমনই অপরদিকে প্রত্যহ নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইয়া সমস্ত বি(্বসমাজ ও সভ্যতা ধ্বংসের আশঙ্কা দেখা দিতেছে।

সুতরাং প্রাকৃতিক সম্পদ এমনভাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত যাহাতে প্রকৃতি সংহজেই তাহা পূরণ করিতে স(ম হয়। যখন ফল গ্রহণ করা হয় তখন তাহাতে বৃ(র অপকার হয় না বরং তাহার উপকারই হয়। কিন্তু অধিকতর শস্য উৎপাদনের চেষ্টায় রাসায়নিক সার ব্যবহার করার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে ভূমির উর্বরা শক্তি(নষ্ট হয়। এই কারণে আমেরিকায় ল(ল(একর জমি শস্যহীন হইয়া রহিয়াছে।

কতদিন এই ধ্বংসের নৃত্য চলিতে পারে?

শিল্পপতিরা তাহাদের ক্র(মশঃ ীয়মান যন্ত্রপাতির পরিবর্তে নতুন যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য একটি (য়পূরণ তহবিল সৃষ্টি করেন। তাহা হইলে প্রকৃতির (য়পূরণ তহবিল কেমন করিয়া অবহেলা করিব? এই দিক হইতে বিচার করিতে গেলে আমরা বুঝিতে পারিব যে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের (ত্রে অমিতব্যয়ী হইলে চলিবে না বরং সংযমী হইতে হইবে। যাহা প্রয়োজন তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। এইজন্য ঈ(্বর প্রচুর সম্পদ আমাদের দিয়াছেন। শুধু উৎপাদন ও ব্যবহারের জন্য মানুষের সৃষ্টি হয় নাই। ইঞ্জিনের কয়লা প্রয়োজন কিন্তু কয়লা জ্বালানোই ইঞ্জিনের উদ্দেশ্য নয়। প(াস্তরে যতসম্ভব কম কয়লা ব্যবহার দ্বারা সর্বশক্তি(সংগ্রহই উদ্দেশ্য। ইহাই অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গ ী। এই আদর্শ স্মরণ রাখিয়া আমাদেরও মানবজীবনে ন্যূনতম বস্তু ব্যবহার দ্বারা অধিকতম দ্রুত ল(্যে উপনীত হইতে হইবে। এই ব্যবস্থাই প্রকৃত সভ্যতা। এই ব্যবস্থায় মানুষ একদেশদর্শী হইতে পারিবে না এবং জীবনের সকল দিক এমন কি পরম ল(্যের

কথাও উপলব্ধি করিবে। ইহাতে প্রকৃতিকে শোষণ করা হইবে না—ইহা দ্বারা প্রকৃতির পোষণ হইবে এবং নিজেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটিবে। গ(হত্যা না করিয়া তাহার দুগ্ধ পান যেমন বাঞ্ছনীয়, তেমনই প্রকৃতিকে ধ্বংস না করিয়া তাহার অতিরিক্ত(উৎপাদন আমাদের জীবন র(ার জন্য গ্রহণ করাই আমাদের কাম্য।

এই মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গী যদি অর্থব্যবস্থাকে উদ্বুদ্ধ করে তবে অর্থনৈতিক চিন্তায় বৈপ-বিক পরিবর্তন ঘটিবে। পশ্চিম (দেশগুলিতে (তাহা পুঁজিবাদী বা সমাতন্ত্রবাদী যাহাই হউক না কেন) মূল্যকে অর্থনীতিতে প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। সকল অর্থনৈতিক চিন্তা ''মূল্যের'' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে মূল্য সম্পর্কে বি(-ষণ প্রয়োজনীয় হইতে পারে কিন্তু যে সমাজচিন্তা সম্পূর্ণভাবে মূল্যের উপর গড়িয়া উঠে তাহা অসম্পূর্ণ, অমানবীয় ও কতকাংশে ন্যায়নীতির বিরোধী। উদাহরণ স্বরূপ একটা (-াগান আজকাল প্রায়ই শোনা যায় তাহার কথাই ধরা যাক। অর্থাৎ ''ব্যক্তি(কে অন্ন অর্জন করিতেই হইবে। সাধারণতঃ কম্যুনিস্টরা—এই (-াগান দেয় কিন্তু পুঁজিবাদীরাও পুঁজিও উদ্যোগকে উৎপাদনের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয় মনে করেন এবং সেইজন্য লভ্যাংশের অধিক চাহেন। তাঁহারা মনে করেন যে ইহা তাঁহাদিগের ন্যায্য প্রাপ্য। প(াস্তরে কম্যুনিস্টরা মনে করেন যে একমাত্র শ্রমই উৎপাদনের প্রধান উপাদান। সুতরাং তাঁহারা উৎপাদনের বৃহত্তর অংশ শ্রমিকেরই প্রাপ্য বলিয়া দাবী করেন। এই দুইটি মতে কোনটিই সত্য নহে। আমাদের আদর্শ যে ব্যক্তি(উপার্জন করিবে তাহাকে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি(র যথেষ্ট আহার্য্য জোগাইতে হইবে। অন্নের অধিকার জন্মগত। উপার্জনের শক্তি(বিদ্যা ও শি(া সাপে(। সমাজে যাহারা উপার্জন করিতে পারে না তাহাদেরও আহারের অধিকার আছে। শিশু এবং বৃদ্ধ, (গ্ন এবং অশক্ত(সকলের দায়িত্বই সমাজের, প্রায় প্রত্যেক সমাজই এই দায়িত্ব প্রতিপালন করেন। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই আদর্শকে সার্থক করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি(শুধু তাহার (টির জন্য কার্য্য করে না—এই আদর্শ পূরণের জন্যই পরিশ্রম করে। অন্যথায় যাহাদের আহার্য্য আছে তাহারা কার্য্য করিত না।

''খাদ্য, বস্ত্র ও বাসগৃহ'' মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন। যে কোন অর্থব্যবস্থাকে এই প্রয়োজন পূরণ করিতে হইবে। সেই সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তি(কে সমাজের প্রতি তাহার দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করার শি(া সমাজকেই দিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি(রোগাক্র(ান্ত হয় তবে তাহার দায়িত্বও সমাজকেই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি কোন সরকার এই প্রাথমিক প্রয়োজন পূর্ণ করে তবে তাহাকে ধর্মীয় শাসন বলা যায়। অন্যথায় ইহা অধর্মের রাজ্য। কালিদাস তাঁহার রঘুবংশে রাজা দিলীপের বর্ণনায় বলিয়াছেন, ''প্রজাদের পালন, র(া ও শি(া দিতে তিনি পিতৃতুল্য ছিলেন।'' নৃপতি ভরত—যাঁহার নামে আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে তাঁহার বর্ণনাতেও রাজাকে প্রজা পালক ও র(াকর্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যদি এই দেশে পোষণ ও সংর(ণের নিশ্চয়তা না থাকে তবে এই দেশের ভারত নাম অর্থহীন।

শি(া সামাজিক দায়িত্ব

শিশুকে শি(াদান সমাজের স্বার্থ। জন্মগতভাবে শিশু একটি জীব মাত্র। সে শি(া ও সংস্কৃতির গুণে দায়িত্বশীল নাগরিকে পরিণত হয়। যদি বেতন দিতে না পারায় শিশু শি(া হইতে বঞ্চিত হয় তবে সমাজই (তিগ্রস্ত হয়। আমরা বৃ(রোপণের জন্য বা বীজবপনের জন্য অর্থদাবী করি না। বরঞ্চ আমরা এজন্য ব্যয় করি। আমরা জানি যে যখন বৃ(বড় হইবে তখন তাহা আমাদের ফল জোগাইবে। শি(ার জন্য অর্থ ব্যয় এই প্রকার পুঁজি বিনিয়োগ। ১৯৪৭ সালে পূর্বে ভারতবর্ষে কোন দেশীয় রাজ্যে শি(ার জন্য অর্থ দাবী করা হইত না। গু(কুলে বরং খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইত। পূর্বে বিদ্যার্থীরা সমাজের নিকট সাহায্য ভি(া করিত। কোন গৃহস্থ বিদ্যার্থীকে ভি(া দিতে অস্বীকৃত হইত না। অর্থাৎ সমাজ শি(ার ব্যয়ভার বহন করিত।

এই মত ব্যক্তি(র চিকিৎসার জন্য অর্থদাবীও বিস্ময়কর। আমাদের দেশে সেই ব্যবস্থাই ছিল। আজকাল লোককে মন্দিরে গেলেও পয়সা দিতে হয়। তি(পতি বা বালাজীর মন্দিরে প্রবেশ গুল্ক পঁচিশ পয়সা। যদিও দিবা দ্বিপ্রহরে এক ঘণ্টা ধর্মদর্শনের ব্যবস্থা আছে—এই সময় দর্শনী দিতে হয় না। যেন অন্যসময় অর্ধদর্শন হয়! সামজকে মানুষের শরীর, মন, বৃদ্ধি ও আত্মার বিকাশের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ করিতে হইবে।

সকলের কাজের ব্যবস্থা

ইহা স্পষ্ট যে ব্যক্তি(র ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের জন্য ব্যয়ভার নির্বাহের প্রয়োজনীয় অর্থ আমাদের উৎপাদন করিতে হইবে। সুতরাং যেখানে ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা সমাজকে করিতে হইবে, তখন সেখানে সমাজের অঙ্গ হিসাবে ব্যক্তি(কেও সমাজের স্বার্থে উপযুক্ত(পরিশ্রম করিতে হইবে। যে ব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যাহত হয় তাহা বিনাশের কারণ। ইহাতে ব্যক্তি(র কর্তব্য প্রতিপালিত হয় না। শুধু তাহাই নহে, যদি কাহারও প্রয়োজন পূরণ করা যায় অথচ সে সেই চেষ্টায় সহযোগিতা না করে তবে তাহার মানবীয় প্রগতি ব্যাহত হয়। মানুষের পাকস্থলী যেমন আছে, তেমন হাতও আছে। যদি সে কাজ না করে তবে খাদ্য পাইলেও সে সুখ পাইবে না। কর্মহীন মানুষ অসুখী হইতে বাধ্য।

আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কর্ম(ম মানুষের সংস্থান করিতেই হইবে। বর্তমানে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি ল(্য করিতেছি। একদিকে দশ বৎসরের শিশু ও অশীতিপর বৃদ্ধকে কাজ করিতে হইতেছে, অপরদিকে পঁচিশ বৎসরের যুবক কর্মাভাবে আত্মহত্যা করিতেছে। এই অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইবে। ঈ(র মানুষকে হাত দিয়াছেন কিন্তু তাহার শক্তি(সীমাবদ্ধ। তাহাদের যন্ত্র বা মূলধনের প্রয়োজন। শ্রম ও মূলধনের সম্পর্ক

মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের অবিকল অনুরূপ। উভয়ের সাহায্যেই এই পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের কোনটিকেই অবহেলা করা চলে না।

মূলধন সৃষ্টি

মূলধন সৃষ্টির জন্য উৎপাদনের একাংশ সঞ্চয় অত্যন্ত আবশ্যক। ইহা দ্বারা অধিকতর উৎপাদন করিতে হইবে। সুতরাং মূলধন সৃষ্টির জন্য সংযমের প্রয়োজন। ইহার মূলধন সৃষ্টির মূলনীতি যাহাকে কার্ল মার্কস অতিরিক্ত(মূল্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিল্পপতিরা এই অতিরিক্ত(মূল্য দ্বারা মূলধন সৃষ্টি করেন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজ্য এই দায়িত্ব গ্রহণ করে। উভয় ব্যবস্থাতেই সমস্ত অর্থই শ্রমিকের মধ্যে বিতরিত হয় না। যদি কোন বৃহৎ কেন্দ্রীভূত শিল্প দ্বারা উৎপাদন করা হয় তবে মূলধন সৃষ্টিতে শ্রমিকের যে ভূমিকা তাহা উপযুক্ত(স্বীকৃতি লাভ করে না। বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধা এই যে শ্রমিক সেখানে এই অতিরিক্ত(মূল্য বা মূলধন পরিচালনার প্রত্য(ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত থাকে। যন্ত্র মূলধনের আধুনিক রূপ। মানুষের শ্রম অর্থের দ্বারা ক্রী(ত বস্তু হিসাবে বিবেচিত হয় সেখানেই যন্ত্র মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়। পুঁজিবাদী সমাজের প্রধান ত্রুটি এই যে যন্ত্রকে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষকে অবহেলা দ্বারা যন্ত্রের আবিষ্কারের আসল উদ্দেশ্যকেই অস্বীকার করা হইয়াছে। ইহা যন্ত্রের অপরাধ নয়। ইহা অর্থনৈতিক ও সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটি। আমাদের যন্ত্রের উপযোগীতার সীমা সম্পর্কে অবহিত হইয়া ইহার প্রয়োগের কথা চিন্তা করিতে হইবে। এইজন্য পাশ্চাত্য হইতে আমদানী করা (যেখানে লোক সংখ্যার স্বল্পতা হেতু যন্ত্রের প্রয়োগ অধিক) মারাত্মক ভ্রান্তি। যন্ত্রের উপযোগিতাও কালের দ্বারা নিরূপিত হয়। যন্ত্র বিজ্ঞানীগণের আবিষ্কার কিন্তু তাহাদের প্রতিনিধি নহে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে কোন কোন দেশের একচেটিয়া অধিকার নাই। কিন্তু ইহার প্রয়োগকালে প্রত্যেক দেশের অবস্থা এবং উপযোগীতার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। ইহা শুধু আমাদের আর্থিক প্রয়োজন দ্বারাই নির্ণীত হইবে না, আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ল(্যের কথাও এ সম্পর্কে স্মরণ রাখিতে হইবে।

অধ্যাপক বি(ে(র রায় তাঁহার একটি পুস্তকে লিখিয়াছেন যে উৎপাদন ব্যবস্থা বিবেচনা করার সময় সাতটি M (Seven M) এর কথা চিন্তা করিতে হইবে। এগুলি হইল—

১। Man (মানুষ) ২। Material (কাঁচামাল) ৩। Money (অর্থ)
৪। Management (পরিচালনা) ৫। Motive Power (শক্তি( )
৬। Market (বাজার) ৭। Machine (যন্ত্র)

যে শ্রমিক কার্য্য করিবে তাহার দ(তা এবং (মতার কথা বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত কাঁচামালের সহজ সরবরাহ থাকা চাই।

অর্থ ও মূলধন কত পাওয়া যাইবে ও কিভাবে ও কি পরিমাণে এই মূলধন বৃদ্ধি করা সম্ভব? ইহা পূর্ণ উৎপাদনের জন্য কি ভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহার কতটা স্থায়ী সম্পদ ও কতটা নগদে লগ্নী করা যাইবে? পশু ও মানুষের শ্রম ব্যতীত আর কি প্রকার শক্তি যেখানে পাওয়া যাইতে পারে? হাওয়া, জল, তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ বা আনবিক শক্তির কোনটির সাহায্য পাওয়া যাইবে এবং তাহার আনুমানিক ব্যয় উৎপাদনের উপযোগী হইবে কিনা তাহা বিবেচনা করিতে হইবে।

এই প্রকারে দক্ষ পরিচালনার বিষয়ও চিন্তা করা প্রয়োজন। যদি শ্রমিকদের শ্রম সুসংগঠিত না হয় তবে তাহার ফলে তাহারা কর্মহীন হইয়া থাকিবে।

উৎপাদিত দ্রব্যের উপযোগিতা, তাহার চাহিদা ইত্যাদিও বিবেচনার প্রয়োজন, পক্ষান্তরে আজকাল প্রথমে যন্ত্রের প্রবর্তন এবং পরে অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয়ে চিন্তা করা হয়। কোন দেশের শিল্পোন্নয়ন এই প্রকার নীতি দ্বারা হয় নাই।

এই সাতটি প্রয়োজনের একটিরও পরিবর্তনের উপায় নাই। যাহাদের উপর পরিকল্পনার দায়িত্ব তাহাদের একথা চিন্তা করিতে হইবে। মানুষের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির জন্য যন্ত্রের প্রয়োজন। কিন্তু যদি এমন হয় যে যন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে লোক কর্মহীন হয় তবে তাহা সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে সঙ্কটের সৃষ্টি করিবে। যদি বিদেশ হইতে অত্যাধিক মূল্যে যন্ত্র আমদানী করা হয় যাহার উৎপাদন আর্থিক লাভজনক না হয় তবে তাহা অযৌক্তিক। সুতরাং "প্রত্যেক কর্মীকে খাদ্য দিতে হইবে" এভাবে চিন্তা না করিয়া "যাঁহারা আহার করে তাহাদের সকলকে কাজ দিতে হইবে" এই ভাবে চিন্তা করা উচিত। চরকার পরিবর্তে যন্ত্রের ব্যবহার আবশ্যক কিন্তু তাহা এমন নয় যে সর্বত্র স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

অর্থনীতিতে মানুষের স্থান

মানুষের কর্মশক্তি ও কর্মের ব্যবস্থা মানুষের পূর্ণসত্বা সম্পর্কে অবহিত হইয়াই করিতে হইবে। গত কয়েক শতাব্দীর অর্থনৈতিক চিন্তাধারা মানুষের মনুষ্যত্ববোধক উপেক্ষা করিয়াছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মানুষকে একটি "আর্থিক মানুষ" হিসাবে বিচার করা হইয়াছে। এই আর্থিক মানুষের নিকট পাঁচ টাকা সর্বদা চার টাকা হইতে অধিক। সে কেবল অধিক অর্থ অর্জনের জন্য কাজ করে। অন্য সকল বস্তুর মত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষের শ্রমও বাজারে খরিদ বিক্রয়ের সামগ্রী। এই প্রতিযোগিতায় কেহই থামিতে চাহেন না এবং যে দুর্বল বা পশ্চাৎপদ হয় তাহার সাহায্যে কেহ আগাইয়া আসে না। সে একটি আর্থিক ভারস্বরূপ এবং তাহার অস্তিত্বের প্রয়োজন অস্বীকৃত হয়। ইহার ফলে আর্থিক শক্তি মাত্র কয়েকজন লোকের হস্তে পুঞ্জিভূত হয় কিন্তু যখন একচেটিয়া

অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন প্রতিযোগিতার দমন যে বিবেচনা তাহাও অবশিষ্ট থাকে না এবং যথেষ্ট মূল্য নির্ধারণ এবং উৎপাদিত দ্রব্যের নাম নিম্নগামী হয়।

এমন কি খরিদ্দারের প্রয়োজন সম্বন্ধেও তাহার চাহিদা অপেক্ষাকৃত ক্রয়শক্তির কথাই পুঁজিবাদীরা বিবেচনা করে। যাহারা অর্থশালী তাহাদের কথাই অধিক চিন্তা করা হয়— যাহারা দরিদ্র বা অর্থ প্রদানে অসমর্থ তাহাদের কথা চিন্তা করা হয় না। এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাহাতে খরিদ্দার উৎপাদকের নির্দেশ অনুযায়ী চলিতে বাধ্য হল! অতএব পুঁজিবাদ মানুষের পূর্ণস্বত্বা বিকাশে অনুপযুক্ত।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা-ইহার প্রতিক্রিয়া

সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়া (Reaction)। কিন্তু ইহাতেও মানুষকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয় নাই। সমাজতান্ত্রিকরা ব্যক্তির পরিবর্তে রাজ্যের নিকট পুঁজি হস্তান্তরিত করিয়াছে কিন্তু রাজ্য অধিকতর অমানবীয় এবং যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান মাত্র। রাজ্যের সকল কর্ম শুধু প্রাণহীন আইন কানুন মানিয়া চলে। ব্যক্তির যে বিবেচনা থাকে রাজ্যের তাহা থাকে না। যদি সামান্য ব্যতিক্রম ঘটে তবে তাহা দুর্নীতি ও আত্মীয় পোষণের কারণ হয়। পুঁজিবাদী সমাজ শুধু আর্থিক মানুষের কথা চিন্তা করিয়াছে এবং তাহার অন্যান্য স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। সমাজতন্ত্র "কল্পিত মানুষের" (Abstract Man) ধারণার বশবর্তী হইয়া আরও অধিক অগ্রসর হইয়াছে। বিভিন্ন চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের সেখানে বিকাশের সুযোগ নাই। মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে কয়েদখানার ম্যানুয়াল বা নির্দেশে যতটুকু গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সমাজতান্ত্রিক রাজ্যে শুধু ততটুকু গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যক্তি স্বাধীনতার কোন স্থান নাই।

ব্যক্তির উপর রাজ্যের দাবী

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যক্তির কোন সম্পত্তি না থাকায় ব্যক্তিগত সম্পদের কুফল সেখানে নাই। কিন্তু ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের জন্য অধিক উৎপাদনের যে আগ্রহ এবং সঞ্চয়ের চেষ্টা তাহাও সেখানে থাকে না। রাজ্যকে সর্বশক্তির অধিকারী করা হয় এবং সকল বিষয়েই তার নির্দেশ চরম। সেখানে ব্যক্তির ক্ষতি পূরণের কোন ব্যবস্থা নাই। যুগোস্লাভিয়ার খ্যাতনামা কমিউনিস্ট লেখক মেলভিন জিলাসের ভাষায় "The Class of old fashioned exploiters has been eliminated but a new class bureaucratic (?) exploiters has come into existence" —"এখানে পুরাতন ধরনের শোষকদের অবসান ঘটিলেও শাসকবর্গের এক নূতন শোষক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছে।" কার্ল মার্কস্ তাঁহার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে বলেন যে পুঁজিবাদীদের নিজেদের মধ্যেই ধ্বংস বীজ নিহিত আছে এবং পুঁজিবাদের পর কমুনিজম অপরিহার্য।

ইহাতে কমিউনিস্ট কর্মীদের অনুপ্রাণিত করা হয় সত্য—কিন্তু এই ধরনের গোঁড়ামি বা উগ্র মতবাদ মানুষের প্রেরণাহীন ও কর্মশক্তি(নষ্ট করে। এ অবস্থায় সে আর নতুন ব্যবস্থার স্রষ্টা থাকে না—সে তখন একটি পূর্বনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যন্ত্রে পরিণত হয়। সুতরাং সে তখন শ্রমিক সংগঠন গড়িলেও শ্রমিকদের ভালমন্দ সম্পর্কে উদাসীন এবং তাহাদের শুধু বিপ-বের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আদর্শ ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধ্বংস করিয়া রাষ্ট্রের প্রাধান্য স্থাপন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাহার পরে কি সমাজের বিবর্তন ধারা (দ্ধ হইয়া যাইবে? প্রতিবিপ-বীদের ধ্বংস করার নামে রাষ্ট্র তখন অধিক হইতে অধিকতর (মতার অধী(ের হয়। মার্কসীয় মতে দ্বান্দ্বিকনীতি বিকাশের ধারাকে (দ্ধ করা প্রতিত্রি(য়াশীলতা। সুতরাং মার্কস এখানে নিজের নীতিরই বিরোধিতা বা অসারত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক কোন ব্যবস্থাই মানুষের একাত্মতা বা পূর্ণরূপ প্রত্য(করে নাই এবং তাহার আশা আকাঙ্খা ও ব্যক্তি(ত্বের মর্যাদা দেয় নাই। একদল তাহাকে অর্থলিপ্সু স্বার্থপর হিসাবে চিন্তা করে এবং অপর দল তাহাকে প্রাণহীন যন্ত্রমাত্র মনে করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা "Survival of the fittest" বা অরণ্যের নীতি মানুষকে যেমন প্রতিযোগিতার যন্ত্ররূপে বিচার করিয়াছে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাহাকে বিরাট অংশ এবং কড়াকড়ি বিধিনিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাজ্যের নির্দেশ ব্যতীত কোন কিছু করিতে অ(ম এক অসহায় জীবে পরিণত করিয়াছে। উভয় ব্যবস্থাই অর্থ প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক (মতা কেন্দ্রীভূত করিয়া মানুষকে মনুষ্যত্বহীন করিতে উদ্যত বা স(ম হইয়াছে। ঈ(ের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ আজ তাহার নিজস্ব স্বকীয়তা হারাইতে বসিয়াছে। আমাদের ইহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমরা পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্র কোনটাই মানুষের উপযোগী বলিয়া বি(াস করি না। মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধিই আমাদের ল(্য। উভয় ব্যবস্থাতেই মানুষকে লইয়া জুয়া খেলা হইতেছে। এই ব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য আমাদের কর্তব্য—(আমাদের সদর্থক ব্যবস্থা)

১। প্রত্যেকটি ব্যক্তি(কে তাহার নিম্নতম প্রয়োজন পূরণের পূর্ণ আ(াস প্রদান করা।
২। যাহাতে ব্যক্তি(সমাজ ও বি(ে আদর্শ বিকশিত হয় তার জন্য ন্যায়নীতি অনুযায়ী এই ন্যূনতম প্রয়োজনের অধিক সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টন।
৩। প্রতি স(ম ব্যক্তি(র কর্মের সংস্থান এবং যাহাতে অসংযমী আচরণ দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট না হয় তাহার ব্যবস্থা।
৪। ভারতের অবস্থা অনুযায়ী যন্ত্রের উদ্ভাবন এবং সকল প্রকার বিষয়ে (Seven M) বিবেচনা পূর্বক তাহার প্রয়োগ।

৫। যাহাতে মানুষ উপে(ত না হয় এবং সাংস্কৃতিক ও জীবন মানের পূর্ণ বিকাশ ঘটে তেমন ব্যবস্থার প্রবর্তন।
৬। মালিকানা সংত্র(ান্ত (রাষ্ট্র, ব্যক্তি(গত বা অন্যরূপ) সকল শিল্প বিষয়ে বাস্তব অবস্থা ও উপযোগীতা অনুযায়ী বিবেচনা।

এই জন্য স্বদেশী বস্তু ব্যবহারের আদর্শ ও আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের নীতি আমাদের নিকট অধিক সমাদৃত। গত বহু বৎসর যাবৎ কেন্দ্রীয়করণ এবং একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিয়া আসিয়াছে। ইহার পরিণতি স্বরূপ সমাজ ও বি(ের সঙ্কট দেখা দিয়াছে।

অতদূর পর্যন্ত আমরা শুধু দার্শনিক তথ্যের আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু জনসঙেঘর কর্মীরা শুধু দার্শনিক বা নি(য় দর্শন নহেন। আমরা আমাদের জাতিকে শক্তি(শালী, সুখী ও সমৃদ্ধ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং আমাদের জাতীয় পুন(থানের জন্য সত্রি(য় হইতে হইবে। আমরা শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে তত্ত্বাবধায়ক হইতে চাহি না।

আমাদের ল(্য শুধু সংস্কৃতির র(া নহে, ইহাকে বর্তমান যুগোপযোগী নবরূপে রূপায়ণ। আমাদের সুস্থ ও প্রগতিশীল জীবনযাপন করিতে হইবে। আমাদের বহু অনুপযুক্ত(প্রাচীন প্রথার অবসান ও সত্যের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্যও অনুভূতির বিকাশ ঘটাইতে হইবে।

"চিতি" বা "চৈতন্য" জাতীয় আত্মা—যাহা জাতিকে শক্তি(যোগায় ও সত্রি(য় করে তাহার নাম "বিরাট"। মানুষের জীবনে প্রাণের যে কাজ, জাতির জীবনে 'বিরাটের' সেই কাজ। যেভাবে প্রাণ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে সত্রি(য় রাখে এবং দেহ ও আত্মার সমন্বয় সাধন করে সেইমত বিরাটই শুধু জাতির কল্যাণ গণতন্ত্র ও সরকারকে উজ্জীবিত রাখে। জাতির জীবনে বিভিন্ন বৈচিত্র তাহার ঐক্যের পরিপন্থী হয় না। ভাষা, পেশা ইত্যাদির পার্থক্য সর্বত্র আছে কিন্তু যখন এই বিরাট জাগ্রত হয় তখন বৈচিত্র সংঘর্ষের পরিবর্তে সহযোগিতার দ্বারা পরস্পরাকে শক্তি(শালী করিয়া তোলে এবং জাতির মহান আদর্শের প্রতিষ্ঠা হয়।

আমাদের এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া দুস্তর পথ অতিত্র(ম করিতে হইবে। নর'কে নারায়ণে পরিণত করাই আমাদের দেশের আদর্শ এবং ঈ(ের আমাদের মহান ব্রতের সার্থকতার দ(ে শক্তি(দিন।

-ভারত মাতা কী জয়-